পুণ্য প্রেম

শ্রীনীলকমল সেন

প্রাপ্তিস্থান—
বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

মূল্য সাত সিকা

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
সেনবাড়ী
সিংহেরগাঁও, ত্রিপুরা

১৩৩৩ সন

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

উপহার

এই পুস্তকখানি

শ্রী.. ....কে

....

প্রদত্ত হইল।

শ্রী

তারিখ.................

নিবেদন

বন্ধুদের আগ্রহে তাড়াতাড়ি
পুস্তক ছাপাইতে হইল।
দোষ-ত্রুটির জন্য পাঠকদের
নিকট ক্ষমা চাই—

গ্রন্থকার

পুণ্য প্রেম

সূচনা

"সরে আয় মনু, শাগ্গির এদিকে ; ফুলগুলো ত ছুঁয়ে দিলে ওরা ! মুখপোড়া ছেলেগুলো আর জায়গা পেলে না পা ধুতে, নাম্লো এসে একেবারে ঠাকুরের ঘাটে !"—বলিয়াই মা চোখমুখ লাল করিয়া ঘাট হইতে ছ' বছরের মেয়ের দিকে চাহিলেন।

ছেলে তিনটী ; সকলেই কিশোরবয়স্ক। যে সকলের ছোট অথচ হৃষ্টপুষ্ট, সে ঐ কথা শুনিয়াই এক পা দুই পা করিয়া পিছনে সরিতে লাগিল। যে সকলের বড়, সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আর যে ছেলেটী মেজ, সে সোজাসোজি নীচের দিকে গেল। অমনি বড় ছেলেটী মেজটীকে বলিল, "কাজ কি ভাই, ঘাটে গিয়ে ? উনি বারণ কচ্ছেন, উঠে এসো।"

মেজ ছেলেটী বলিল, "জলে পা ধোব, এতে দোষটা কি ? আমরা হাড়ি-ডোম না ধাঙ্গড়-মেথর যে, জল ছোঁবো না ?"

মাতা যেন তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুই কায়েতের ছেলে হয়ে জেলের ছেলের সাথে পীরিতি কচ্ছিস্, তোর জাত কোথা র'ল রে ভুবন ! এখ্খুনি উঠে যা, বলছি। বাড়াবাড়ি কল্লে কিন্তু ভালো হবে না, একঘ'রে না করে' ছাড়্বো না।"

মেয়ে-মানুষের কথায় কাণ না দিয়া ভুবন পা ধুইতে লাগিল; তারপর উপরে উঠিয়া কৌতুক করিবার জন্য মেয়েটীর হাতের ফুলের সাজি ছুঁইয়া দিয়া বলিল, "এই ত তোদের ফুল ছুঁয়ে দিলাম মনু! ফুলগুলো কি এখন ফেলে দিবি?"

মেয়েটী ইহাতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু মাতা রুষ্টা ফণিণীর মত ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে সবেগে উপরে উঠিলেন এবং সজোরে দু-দুটী বড় চড় মারিয়া মেয়েটীর তুল্‌তুলে গাল দু'টীকে টুক্‌টুকে লাল করিয়া দিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ফুল নষ্ট করে আবার হাস্‌ছে পোড়ারমুখি! কি জ্বালা! তিনটী নচ্ছার জুটে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুল্‌লে!"

মেয়েটীর চক্ষু ফাটিয়া হুড় হুড় করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল! তাহাতে ছোট ছেলেটী বড়টীর দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "দেখো নীরোদ-দা, ভুবন-দার কাণ্ডটা! ফুলগুলো ছুঁয়ে দিয়ে কেন নষ্ট কর্‌লে ভুবন-দা?"

নীরদ তাড়াতাড়ি কোঁচার কোণে বালিকাটীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেঁদো না মনোরমা! আমি এখুনি একসাজি ফুল পাঠিয়ে দেবো। চলো বলাই-ভুবন, এখন যাওয়া যাক্!"

নীরদের পাছে পাছে ভুবন ও বলাই গ্রামের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। এদিকে মা মেয়ের হাত হইতে সাজিটা ছিনাইয়া লইয়া ফুলগুলি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন! কিন্তু মেয়েটী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, বালকদের একটীর দিকে এক নজরে চাহিয়া রহিল। কে বলিবে, কাহার উপর তাহার এমন প্রখর নজর?

পুণ্য প্রেম

১

নন্দনপুরের চন্দন-পুকুরের উত্তরপারে যে একখানি সুন্দর ফুলের বাগান মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে, উহার পার্শ্বস্থিত উচ্চ ইংরাজি স্কুল স্থাপনের তের বৎসর আগের কথা বলিতেছি। তারো কয়েক বছর আগের কথাটা সংক্ষেপে বলা মন্দ নয়; তাহাতে বিষয়টা অধিক সুস্পষ্ট হইবে। তখন পূবের-গাঁও গ্রামের হরকিশোর বিশ্বাসের চণ্ডী-মণ্ডপে পাঠশালা বসিত, তাহাতেই নন্দনপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী আরও পাঁচখানি গ্রামের বালকেরা লেখা-পড়া করিত। এই পাঠশালায় যে কয়টী বালক পড়িত, তাহাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া উপযুক্তবোধে ডবল প্রমোশন দিয়া নীরদবরণ, ভুবনমোহন ও বলাইচাঁদ নামে তিনটী বালককে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই হইতেই এই তিনটী বালকের মধ্যে সদ্ভাব খুব বাড়িতেছিল। তিনটী বালকই মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী; সুতরাং এই তিনটী বালক প্রতি পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইয়া প্রশংসালাভ করিয়া আসিতেছিল; তাহার ফলে

তাহাদের সখ্যের বন্ধনও সুদৃঢ় হইয়াছিল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল, ছুটীর পর একে অন্যকে ছাড়িয়া যাইতে যেন বুকে বাজিত। তাই খেলা-ধূলায়, একাজে সেকাজে যতক্ষণ পারিত, তাহারা একত্র থাকিত, সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে পরে বিষণ্নমনে বাড়ী ফিরিত। তাহারা একে অন্যকে 'বন্ধু' বলিয়াই ডাকিত এবং এই ডাকের মধ্যে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না।

এ তিনটী বালকের মনোমিলনের হেতুটা স্কুলের দিক দিয়া যেমন সুস্পষ্ট, অন্যদিক দিয়া তেমন নয়। তখন পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা একটু বেশী বয়সেই লেখাপড়া আরম্ভ করিত। এ তিনটী বালক যখন পঞ্চম শ্রেণীতে, তখন নীরদের বয়স তের আরম্ভ হয়। তাহার পিতা হরিদাস ভট্টাচার্য্যের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, তবে খাওয়া-পরারও কষ্ট নাই। চাষে যে কয় বিঘা জমি আছে, তাহাতেই সংসার ও পূজা-পার্ব্বণের খরচ চলে। তাঁহার হাতেও নগদ সামান্য কিছু আছে, কিন্তু তিনশতের বেশী নয়। তিনি উপাধি-প্রাপ্ত পণ্ডিত। জ্ঞানী বলিয়া সকলেই তাঁহার সম্মান করে, বংশ-মর্য্যাদায়ও তিনি সম্মানের দাবী রাখেন। শ্রীরামদির ভট্টাচার্য্য-বংশের নাম শুধু নিজের মহকুমায় নহে, সমুদয় জেলায় প্রচারিত।

ভুবনের বয়সও কম নয়, এগার ছাড়াইতে চলিয়াছে। বলাই এবং ভুবন প্রায় সমবয়সী। দেখিতে বলাইকে একটু বেশী বয়সের দেখায়, কিন্তু সেই ভুবনের চেয়ে তিন মাসের ছোট।

ইহাদের উভয়েরই বাড়ী প্রতাপপুরে। এই গ্রাম, নীরদদের গ্রাম ও নন্দনপুর পাশাপাশি অবস্থিত।

ভুবনের পিতা কালীমোহন রায় কায়স্থ-সন্তান। গ্রামে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তিনি বার-তের হাজার টাকা সুদে খাটান; তাঁহার তালুকের আয়ও মন্দ নয়, প্রায় দেড় হাজার। ধরিতে গেলে প্রতাপপুরের জমিদার তিনিই। ঐ গ্রামে যে কয়ঘর জেলে-কৈবর্ত্ত বাস করে, বলাইর পিতা কালাচাঁদ মণ্ডল ছাড়া আর সকলেই তাঁহার প্রজা। তাঁহার পিতার পূর্ব্ব অবস্থা নেহাত হীন ও নগণ্য ছিল। লোকে বলে, গুপ্তধন পাইয়া তিনি রাতারাতি বড় মানুষ হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় উপাধিটা বদলাইয়া শুধু 'রায়' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন।

একদিন স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত গগনচন্দ্র সমদ্দার পি, ঘোষের পাটীগণিত হাতে পঞ্চমশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের তিনটী অঙ্ক এককালে লেখাইয়া দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "সাবধান! কেউ যেন কারো দিকে চেয়ো না, মন দিয়ে নিজ নিজ খাতায় আঁক কষো।"

তিনি গণিতখানা বন্ধ করিয়া আধ মিনিট এদিক ওদিক তাকাইলেন, তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের উপর পা দু'খানা উঠাইয়া চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। অবিলম্বে তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জনের শব্দ শুনিয়া ছাত্রগণ বুঝিয়া লইল, তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, আর চাওয়াচায়িতে কিম্বা আলাপ-আলোচনায় কোন শঙ্কা নাই। তারপরেই বালকদের মধ্যে

অবাধে কথোপকথন চলিল, সকলেই আঁক তিনটী কষিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের কাছে টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া আসিল।

অঙ্কে নীরদের মাথা খেলিত বেশ। সে-ই অঙ্কটা সকলের চেয়ে বেশী বুঝিত; কিন্তু সাহিত্যে সে সেরূপ পাকা ছিল না। বলাই সাহিত্য সবচেয়ে ভাল জানিত, আর ভুবন সাহিত্য-অঙ্কে সকলের সেরা না হইলেও মোটামুটি জ্ঞান বেশ ছিল, কোন কোন পরীক্ষায় দৈবাৎ সে প্রথম স্থানও অধিকার করিয়া বসিত। তাহার স্মৃতি-শক্তির জোর বেশী ছিল, না বুঝিলেও পড়িয়া বেশ মনে রাখিতে পারিত।

সকলে খাতা দিয়া আসিলে নীরদ পা-টিপি-টিপি করিয়া টেবিলের কাছে গেল এবং বলাই ও ভুবনের খাতা দু'খানা বাহির করিয়া দেখিল, ভুবন তিনটী আঁকই শুদ্ধরূপে কষিয়াছে, আর বলাই একটী অঙ্কের শেষ ভাগটায় ভুল করিয়াছে। অমনি সে দু'টানে বলাইর ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া চুপে চুপে স্ব-স্থানে গিয়া বসিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রক্ত চক্ষুদ্বয় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন সকলেই খাতা দিয়াছে। অমনি তিনি পা দু'খানা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চক্ষু-দ্বয় বেশ করিয়া রগড়াইয়া খাতা পরীক্ষায় মন দিলেন। প্রথমে বলাইর খাতা হাতে পড়িল; তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, সে পরের সাহায্যে একটী অঙ্ক শুদ্ধ করিয়াছে; উহার শেষাংশের লেখাটা

নিজের নয়। তিনি যদি ছাত্রের এ সামান্য চতুরতাটাও না ধরিতে পারেন, তবে তাঁহার এত দিনের শিক্ষা-কার্য্যের অভিজ্ঞতাই বৃথা! তাই তিনি নিজের প্রশংসায় নিজে উৎফুল্ল হইয়া "হুঁ" করিয়া মাথা নাড়িলেন, তারপরে খাতাখানা একধারে রাখিয়া দিলেন।

অন্য খাতাগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি কয়েকটা ছাত্রের শাস্তির ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করিয়া দিলেন। তাহাদের তিনজনকে দাঁড়াইতে হইল, একজনকে উঠিতে হইল বেঞ্চের উপরে। নিজের গুণেই হউক, কিম্বা পরের সাহায্যেই হউক, যাহারা তিনটা আঁকই শুদ্ধরূপে নিজে লিখিয়াছিল, তাহারাই পণ্ডিত মহাশয়ের রোষানল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

তারপর বলাইর শাস্তির পালা। পণ্ডিত মহাশয় বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলাইকে বলিলেন, "সত্য বল্ বলাই, তুই কার সাহায্য নিয়ে আঁক কষেছিস্? বলাই নীরবে মুখ নত করিয়া রহিল দেখিয়া আবার তিনি শাসাইয়া বলিলেন, "বল্ না,—আঁক কি তুই নিজেই কষেছিস্, না আর কেউ করে দিয়েছে?" তথাপি বলাইর কোনও উত্তর না পাওয়ায় তিনি আরও রুষ্টস্বরে বলিলেন, "আয় দেখি,—কাছে আয় তবে!"

ভয়ে বলাইর মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আজ্ঞে, আমিই খাতায় আঁক কষেছি।"

"মিছে কথা! তুই নিজে কখ্খনি করিস্ নি!"—গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া পণ্ডিত মহাশয় ভুবনকে বলিলেন, "ওরে ভুবন!

তুইত ওর পাশেই বসেছিস্ ; তুই বল্ দেখি, এ কার সাহায্যে আঁক কষেছে। সত্যি বল্ ; তোর কোনো ভয় নেই।"

ভুবন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আজ্ঞে আমার মন নিজের খাতায় ছিল, আর কারো দিকে নজর দেইনি।"

"দিস্‌নি !—মিথ্যাবাদি ! তা হ'লে তুইই ওকে সাহায্য করেছিস্ ! আচ্ছা এদিকে আয় দেখি।"—বলিয়াই কাছে আসিতে মাথায় আহ্বান করিয়া তিনি টেবিলের উপর হইতে একখণ্ড সরু বেত হাতে লইলেন।

ভুবন দেখিল বেগতিক,—সত্য না বলিলে নিজকেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। তখন সে কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, "আমি সাহায্য করিনি পণ্ডিত-মশাই, নীরোদ-দা ওখানে গিয়ে খাতায় কি লিখেছে, আমি তার কি জানি।"

এতক্ষণে একটা গুরুতর সত্যের আবিষ্কার করিতে পারায় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখখানি ভারি প্রসন্ন হইল। তিনি কয়েকবার শির সঞ্চালন করিয়া তীব্রদৃষ্টিতে নীরদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন নীরোদ !—ভুবন যা বল্‌ছে, সত্যি ত ?"

পণ্ডিত মহাশয়ের গর্জ্জন ও আস্ফালনে নীরদ একপ্রকার জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখন কৈফিয়ত দিতে হইবে বলিয়া নিজকে সামলাইয়া লইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, সত্যি ; আমিই বলাইর খাতায় লিখেছি।"

"দুষ্টছেলে !—নচ্ছার !!—পাজি !!!—আচ্ছা, রসো,—দশ-ঘা না দিয়ে ছাড়্‌ছিনে। বলাইকেও পাঁচ-ঘা দেবো।"

বলাই গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, "নীরোদ-দার ত দোষ নেই পণ্ডিত-মশাই, আমি সাহায্য চেয়েছি বলেই, তিনি সাহায্য করেছেন। নীরোদ-দার শাস্তিও আমিই ভোগ কর্‌বো।"

নীরদ বলিল, "সত্যের পথে চল্‌তে কেন ভয় খাচ্চ, বলাই? দোষী হ'লে শাস্তিভোগ করাই সঙ্গত এবং যার দোষ, তারই শাস্তি পাওয়া উচিত। পণ্ডিত-মশাই, আমি স্বেচ্ছায় দোষ করেছি, শাস্তি আমারই প্রাপ্য। বলাইকে শাস্তির দায় হতে মুক্তি দিন্। আমি যে দোষী, ভুবনই তা জানে।"

ভুবনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে এবার বড়ই বিপন্ন হইল। নীরদ শাস্তি পায়, ইহা তাহার ইচ্ছা নয়; কাজেই একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, তার আমি কি জানি? বলাই সাহায্য চেয়েছিল কিনা, তাও আমি জানিনে। নীরোদ-দা খাতায় আঁক লিখে যখন ফিরে আস্‌ল, তখন দু'জনেই বড় হাসাহাসি কর্‌ছে, দেখ্‌লাম।"

পণ্ডিত মহাশয় আর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিলেন না, নীরদের পিঠে বেতের পাঁচ-ঘা বসাইয়া দিলেন এবং সকলকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। ফলে এদিন একের শাস্তিতে তিন বন্ধুর মর্ম্মই আহত হইল।

২

পূবেরগাঁও স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাসের শাসনের ব্যবস্থা ছিল অন্যরূপ। কখনও কেহ তাঁহাকে বেতের আঘাতে শাসন করিতে দেখে নাই; কারণ তিনি শারীরিক শাস্তির বিরোধী ছিলেন। পড়া আদায়ের জন্য তিনি হয় টাস্‌ক্ দিতেন, না হয় আটক রাখিয়া শিখাইয়া লইতেন; তথাপি বেত হাতে লইতেন না। ইহা তাঁহার ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষা। পরিদর্শকগণ তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর খুব প্রশংসা করিতেন; ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় তাঁহাকে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি মাহিনায় সদরের স্কুলে নিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যান নাই। তিনি বলিতেন, বাড়ীতে থাকিয়া পাঁচ টাকা কম পাইলেও লাভ। নিজের বাড়ীতেই যখন স্কুল, তখন পাঁচটা ঘণ্টা স্কুলে কাটাইয়া বাকী সময়টা সবই নিজের সংসারের কাজে দেওয়া যায়। ইনি নর্ম্মাল-স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া বাড়ীর উচ্চ-প্রাইমারী পাঠাশালাটীকে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পরিণত করিয়াছিলেন এবং চাঁদা তুলিয়া বড় পুকুরের উত্তর পারে একখানা স্বতন্ত্র স্কুল-ঘরও তুলিয়াছিলেন। ইনি যে শুধু সুশিক্ষক এমন নয়, সজ্জনও। স্থিরতা, ধীরতা, ভদ্রতা, নম্রতা, সরলতা, সহৃদয়তা, ধর্ম্মশীলতা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি নানাগুণ তাঁহার ছিল। তাঁহার আয় কম হইলেও পূজা-পার্ব্বণাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য-

গুলির অংশানুযায়ী খরচ অগ্রজকে বুঝাইয়া দিতেন। তজ্জন্য মাঝে মাঝে কিছু ঋণ করিতে হইলেও এরূপ সদ্‌ব্যয়ের জন্য তিনি কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। বিশ্বাস-বাড়ীতে বার মাসে তের পর্ব্ব রীতিমত চলিত।

ভূগোলের পড়ায় ম্যাপ্ আঁকা হয় নাই বলিয়া একদিন হেড্ পণ্ডিত মহাশয় ষষ্ঠ শ্রেণীর বালকদিগকে আটক রাখিলেন এবং ছুটীর পর বাড়ী যাইবার কালে বলিয়া গেলেন, যে-যে ছাত্র সুন্দর রূপে ম্যাপ আঁকিয়া তাঁহাকে দেখাইবে, তাহারাই কেবল বাড়ী যাইতে পারিবে, অন্যেরা আটক থাকিবে। ইহাতে ভাল ছেলেরা বড়ই অপমান বোধ করিল, এবং নীরদ, ভুবন ও বলাই পরামর্শ করিল, তাহারা আটকই থাকিবে, তথাপি স্কুলে বসিয়া ম্যাপ আঁকিয়া দিয়া বিদায় নিবে না। তাহারা মনে করিল, তাহাদের অপরাধ অতি সামান্য, তজ্জন্য আটক থাকিবার মত গুরুতর শাস্তির যোগ্য তাহারা মোটেই নয়। অন্যান্যে পণ্ডিত মহাশয়কে ম্যাপ দেখাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল; গেলনা কেবল তিন বন্ধু—নীরদ, ভুবন আর বলাই।

সন্ধ্যাকালে চন্দ্রমোহনবাবু বড় পুকুরের ঘাটে হাতমুখ ধুইতে ছিলেন; হঠাৎ তিনি শুনিলেন, স্কুল-ঘরে কয়েকটী লোক কথা-বার্ত্তা বলিতেছে। তিনি সে দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যে তিনটী বালককে তিনি স্কুলের আশা-ভরসা-স্থল মনে করেন, সে তিনটী বালকই স্কুল-প্রাঙ্গনে বসিয়া কথা বলিতেছে। চন্দ্রমোহন বাবু তাহাদের কাছে গেলেন, কিন্তু বালক তিনটী মাথা হেট করিয়া

রহিল। শান্তির কথা তখনও তাঁহার মনে আসে নাই, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কিহে, তোমরা এখনো এখানে কেন? ভুবন আর বলাইর বাড়ী ত প্রায় দেড় মাইল দূরে, যেতে যে আটটা বাজবে।"

নীরদ দাঁড়াইয়া বিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে, আমরা কাল বাড়ী থেকে ম্যাপ্ করে এনে দেখাবো, আজ আমাদের মাপ করুন।"

এতক্ষণে পণ্ডিত মহাশয়ের আসল কথাটা মনে পড়িল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের দুষ্টমির চালটা বোঝ্বার আর বাকী নেই। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে নেহাত বদ হয়ে উঠেছ কি না, তাই! না, আজই ম্যাপ দেখাতে হবে"

এ কথা বলিয়াই পণ্ডিত মহাশয় রাগের ভরে ঘাড় ফিরাইলেন। হঠাৎ বারান্দার উপর তাহার নজর পড়িলে দেখিলেন, একখানি বঙ্গবাসী-পত্রিকায় ঢাকা কি কতগুলি জি। রহিয়াছে। উহা কি, দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন তিনি কোন উত্তর পাইলেন না, তখন নিজেই সেখানে গেলেন এবং স্বহস্তে পত্রিকা-খানা সরাইয়া দেখিলেন, আর একখানা কাগজের উপর চিড়া-মুড়ি, পাটালী গুড়, কয়েকটী কলা ও একটী নারিকেল রহিয়াছে। বালক-তিনটী রাত্রি হইলেও বাড়ী যাইবে না, তজ্জন্য আহারের যোগাড় করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় ইহা সহজেই বুঝিতে পারিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রির আহারের জন্য যথাকালে পণ্ডিত মহাশয়ের ডাক পড়িল। তখন তাঁহার মেজাজটা তেমন ভাল ছিল না ; তিনি বিরক্তির সুরে বলিলেন, "আমার খাওয়ার ঢের দেড়ি, তোমরা খেতে পার।" পরক্ষণেই আবার বলিলেন, "থামো একটু, আমি বার থেকে আস্‌ছি।"—বলিয়াই তিনি পুকুরের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাণ পাতিয়া শুনিলেন, তখনও স্কুলের আঙ্গিনায় বসিয়া সে বালক-তিনটী কথাবার্ত্তা বলিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে আগু হইলেন এবং স্কুলের ধারে বাগানের আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, ভুবন বলিতেছে, "সত্যি বল্‌লে নীরোদ-দা, আমাদের বেজায় আহাম্মুকি হ'ল যে, আমরা পণ্ডিত-মশাইর বাড়ীতে গাঁইটের পয়সায় চিড়ে কিনে খেলাম। পণ্ডিত-মশাইর কিছু খরচ হলেই যে আমাদের জয়টা বেশী হ'ত।"

বলাই হাসিয়া বলিল, "দেখো ভুবন-দার মতলবটা একবার ; দোষ করেছেন, আবার জয়ী হতেও চান। আমাদের মত বদ ছেলেকে খাওয়াতে পণ্ডিত-মশাইর ত বড় দায়!"

"তোরা আমাদের বাড়ী গিয়ে খাস্‌নি কেন রে ?—দুষ্ট ছেলে-গুলো ! যা—শীগ্‌গীর করে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী চলে যা।"—বলিতে বলিতে পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহাতে তাহারা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

তখন অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোকে দেখা গেল, অল্প দূরে দুইটী লোক কথা বলিতে বলিতে স্কুল ঘরের পাশ দিয়া বিশ্বাস-বাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি যাইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিলেন, উভয়েই প্রতাপপুর হইতে ঐ তিনটী বালকের খোঁজে চলিয়াছে। চন্দ্রমোহনবাবু তাহাদিগকে কাছে ডাকিলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, একটী লোক কালীমোহন বাবুর প্রেরিত চাকর, অপরটী বলাইর কনিষ্ঠ সহোদর। তাহারা পথে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে খোঁজ করিয়া আসিয়াছে এবং নীরদের মাতার নিকট জানিয়াছে, সেও স্কুল হইতে ফিরিয়া যায় নাই। তাই তাহারা উভয়ে তাড়াতাড়ি বিশ্বাস-বাড়ীতে খোঁজ করিতে চলিয়াছে।

নীরদের পিতা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন কি না, এ প্রশ্ন পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে আগন্তুক লোকদ্বয় উহার উত্তর দিতে পারিল না। নীরদ বিনীতভাবে বলিল, "বাবা বাড়ীতে নেই, গতকল্য গোপালপুরের পিসিমাকে আন্তে গেছেন।"

পণ্ডিত মহাশয় উত্তর শুনিয়াই গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তাই তুমি সুযোগ পেয়ে এখানে এখন আমোদে মেতেছ?—ভোজ খাচ্চ? হতভাগা বজ্জাত ছেলের দল!—শীগ্‌গির করে চল্ , তাড়াতাড়ি করে দু-দুটো খেয়ে বাড়ী চলে যা।"

তিনটী ছেলেই খাতা-পুস্তক হাতে লইল। ভুবন বলিল, "আমাদের খাওয়া হ'য়েছে, পণ্ডিত-মশাই! আমরা এখন বাড়ী যাচ্চি।"

তাহারা যে চিড়া-মুড়ি খাইয়া উদর পূর্ণ করিয়াছে, ইহা পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন। এদিকে রাত্রিতে তাহার বাড়ীতেও খাওয়ার জন্য তেমন ভাল কিছু জুটান যাইবে না, এ কথাও ভাবিলেন। তাই

তিনি বালকদের গৃহগমনে বাধা দিতে চাহিলেন না। কেবল বলিলেন, "কাল সকালে আটটায় তোমরা তিনজনেই এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে। অবশ্য আস্‌বে, বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।"

ইহা বলিয়াই পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলেন; বালক-তিনটীও বাড়ীর পথ ধরিল। পথে ভুবন বলিল, "কাল কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করা হবে।"

বলাই একটু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "উশুলটা কে করবেন?—পণ্ডিত-মশাই কর্‌বেন না ত?"

নীরদ স্বাভাবিক গম্ভীর ভাষায় বলিল, "আদায়ের ভার ছাত্রদের ওপরে থাকাই ভালো। যে যা' পারো, কিছু-কিছু আন্‌তেই হবে। আমি ভাই, সের-দুই দুধ ছাড়া আর বেশী কিছু যে আন্‌তে পার্‌বো, তার ভরসা নেই। পণ্ডিত-মশাই কাল নিশ্চয়ই না খাওয়ায়ে ছাড়্‌বেন না।"

৩

পরদিবস সকলের আগে আসিল বলাই। তাহার সঙ্গীটী কাঁধের ভার নামাইলে দুইটী বড় রুই মাছ, চারটা পাকা কুমড়, সের-দুই বেগুণ ও তিন হাত লম্বা একটী মান দেখা গেল। ক্ষণকাল পরেই নীরদ আসিল। সে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে এক কলসী দুধ—আন্দাজ দশ-বার সের, আর পাঁচসের ওজনের একটী মিশ্রির পুটলী। চন্দ্রমোহন-বাবু খবর পাইয়াই বাহিরে আসিলেন এবং ছাত্রদ্বয়ের আনীত জিনিষগুলি দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিলেন, "এ বুদ্ধি তোমাদের কে দিয়েছে হে? আমি শুধু দেখা কর্‌তে বলেছি; খেতেও ত বলিনি। খেতে বল্লেই বা কিছু আন্‌তে হ'বে কেন?"

বলাই মুখ নত করিয়া বলিল, "এ বুদ্ধি নীরোদ-দাই আগে বাতলিয়েছেন, আমরা যখন এনেছি, তখন দয়া করে জিনিষগুলো গ্রহণ করুন্। ছাত্র ত পুত্রতুল্য।"

চন্দ্রমোহনবাবুর বড়-দা হরিমোহন বিশ্বাস পাশে দাঁড়াইয়া হুকা টানিতেছিলেন; তিনি সতৃষ্ণনয়নে আহার্য্য জিনিষগুলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ঠিক বাছা, ঠিকই বলেছ;—ছাত্রের দেওয়া পুত্রের দেওয়ার মতনই; ওটা মোটেই অবহেলা করা চলে না। কোথা রে কেষ্টা, এগুলো ভেতরে নিয়ে যা ত।" চাকর কৃষ্ণদাস আসিয়া জিনিষগুলি বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

চন্দ্রমোহন বাবু পাঁচ-সাত মিনিট নীরবে পাইচারি করিতে করিতে কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, "শোন নীরদ-বলাই, অতগুলো মাছ-দুধ আর তরকারী; এর একটা সুব্যবস্থা ত করা চাই। তোমরা দু'জনে এখুনি ছুটে যাও, স্কুলের সব ছেলেকে এখানে খাবার জন্যে বলে এসো, যেন এগারটার আগেই তারা খেতে আসে। তোমরা দু'জনে অবশ্য সব জায়গায় যেতে পারবে না; নিকটে যারা-যারা আছে, তাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দাও। মুসলমান ছাত্রদেরেও বল্‌বে। তারা হিন্দুর রান্না খাবে না; তাদের জন্যে দই-চিড়ার বন্দোবস্ত করা হ'বে।"

ভুবন আসিল আরও দেড় ঘণ্টা পরে—দশটা বাজিতে পনর মিনিট থাকিতে। সে স্নান সারিয়া খাতা-পুস্তক লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিল, উদ্দেশ্য,—নিমন্ত্রণ খাইয়া স্কুল করিয়া বাড়ী যাইবে। পথে ভোলার সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, "পণ্ডিত-মশাইর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্চি।" আর একটু আগু হইলে মাধবও সে কথাই বলিল। অধিকন্তু সে বলিল, "আমি করিম আর মজিদকে নেমন্তন্ন করে ফিরে যাচ্চি।"

ভুবন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি এনেছে, তার খবর রাখো কি?"

মাধব বলিল, "তার কিছু জানিনে; নেমন্তন্নের কথাই কেবল জানি।"

ব্যাপার যে নূতনতর কিছু ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভুবন বাজারের দিকে গেল; যাইতে পথে বলাইর সহিত দেখা

হইল। সে দই, চিড়া, গুড়, কলা ইত্যাদি লইয়া বিশ্বাস-বাড়ীর দিকে যাইতেছে। কে কি আনিয়াছে, বলাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভুবন তাহাও জানিয়া লইল। সে ভাবিয়া দেখিল, কম পয়সায় পান খুব বেশী কিনা যায়, এবং তাহা নীরদ কি বলাই, কেহই আনে নাই। সে বাড়ী হইতে আট আনা সঙ্গে আনিয়াছিল, পানের দোকানে গিয়া দোকানীকে বলিল, "চার আনার পান-স্থপুরী দাও ত!"

"পান ডেড়শ তিন আনা, আর আধ-পো স্থপুরী হ'বে পাঁচ পয়সা। সওয়া-চার আনা হচ্চে, বাবু!"

"না, তবে স্থপুরী নেয়া হবে না; পানই দাও চার আনার।"

দোকানী দুই শত পান বাঁধিয়া দিলে ভুবন বলিল, "বাবা! —অতগুলো পান! না—থাক্, আমি ডেড়শ চেয়েছি, তাই দেও।"

"আপনি ত চার আনার পানই চেলেন, তাই বেঁধে দিলাম। নিন্ না, বাবু;—পান ত যাচ্ছে পণ্ডিত-মশাইর বাড়ীতে। তিনি দেখে খুব খুসি হ'বেন।"

"আমার যা খুসি, তাই নেব; তুমি উপদেশ দেবার কে? আমার ডেড়শ দরকার, তাই দাও; গোল করোনা, বল্‌ছি।"

দোকানী তাহাই করিল। ভুবন পানগুলি হাতে লইয়া বিশ্বাস-বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "স্কুলের ছেলেরা ত পান পায়না, ভুবন! ওগুলো না আন্‌লেও ত চল্‌তো।"

ভুবন মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,"আজ্ঞে, আপনারাও ত খেতে পার্‌বেন। তাতেই আমার দান সার্থক হবে।"

রান্না শেষ হইতে এগারটা বাজিয়া গেল। তার আগেই উপস্থিত পাঁচটী মুসলমান ছাত্রকে বাহিরের একটী ঘরে খাওয়ান হইল; বলাই এবং আরও দুইটী হিন্দু-বালকের সাহায্যে তাহা সম্পন্ন হইল। এদিকে পণ্ডিত মহাশয় হিন্দু-ছাত্রদের আহারের জন্য ভিতরের আঙ্গিনায় একটী চাঁদোয়া তুলিয়া দিলেন, যেন গায়ে রৌদ্র না লাগে। নীরদ এবং আরও কয়েকটী হিন্দু-বালক তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। এসময় বিনোদ নামে আর একটী ছেলের সঙ্গে ভুবন গোপনে কি পরামর্শ করিতেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় নীরদকে বলিলেন, "কয়েকটী সার দিয়ে পাতা বিছায়ে দেও, পূবের ঘরের বারাণ্ডায়ও দু'সার পাতা পাতো।"

নীরদ বিস্ময়ে বলিল, "আমরা মোটেই উপস্থিত একত্রিশ জন। মুসলমান পাঁচ বাদ গেলে, রইলাম ছাব্বিশ জন। এ আঙ্গিনায় ত পঞ্চাশ জনও খেতে পারে, পণ্ডিত-মশাই; বারাণ্ডায় আবার পাতা বিছাবো কেন?"

"হাঁ, তারো প্রয়োজন হবে। আমি যা বল্‌ছি, তাই করো; পরে বোঝ্‌বে, কেন বল্‌ছি।" বলা বাহুল্য, পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশ মতনই কাজ হইল।

ছাত্রগণ খাইতে আসিলে তিনি বলিলেন, "তোমরা পাঁচ শ্রেণীর হিন্দু উপস্থিত; তাই পাঁচ সার দেয়া হয়েছে। এখন বসে পড়ো।"

বিনোদ যদুনাথ-বানার্জির ছেলে, বড় মুখর। সে মনে করে, ন্যায্য যাহা, বল্‌তেই হবে। সেজন্য সে পিতার সহিতও তর্ক

করে। সে বলিল, "নেমন্তন্ন খেতে এসেছি, জাত খোয়াতে ত আসিনি।"

শুনিয়াই নীরদ বলিল, "আমরা স্কুলের ছেলে; জাত-বিচার না কর্‌লেও আমাদের চলে। সমবয়সী সখাদের মধ্যে ওসব ভেদাভেদ না থাকাই ভালো।" কৃষ্ণ বণিক্, কৈলাস বসু, শম্ভুনাথ মণ্ডল প্রভৃতি আরও কয়টী বালকেও সে কথার সমর্থন করিল; আবার দু'তিনটী ছেলে আপত্তিও করিল। তন্মধ্যে ভুবন একজন। কথা কাটা-কাটিতে বড়ই সোর-গোল উপস্থিত হইল দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত হইয়া জোরে হাকিলেন,—"চুপ্-চুপ্।" অমনি সকলে নীরব হইল। তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের সকলের কথার ভেতরেই কিছু না কিছু যুক্তি রয়েছে, সেজন্য তা উপেক্ষা করা চলে না। তোমাদের যেখানে খুসি, বসো। বারাণ্ডায়ও পাতা রয়েছে; যার ইচ্ছে হয়, সেখানেও বস্‌তে পারো।"

ভুবন, যদুনাথ ও আরও তিনটী বালক সাঁ-সাঁ করিয়া বারাণ্ডায় গিয়া উঠিল; সেখানে এক সারিতে ব্রাহ্মণ ও অন্য সারিতে কায়স্থ বালক-দ্বয় বসিল। আঙ্গিনায় যাহারা বসিল, তাহারা আর জাতের বিচার করিল না; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সুবর্ণ-বণিক্, গন্ধ-বণিক্ ও জেলে, সকলেই পাশাপাশি বসিয়া গেল। বসিল না কেবল বলাই; সে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৌতুকের দৃষ্টিতে কাণ্ডটা দেখিতে লাগিল।

হরিমোহন-বাবু হুকা টানিতে টানিতে বলিলেন, "না, এ ব্যবস্থাটা ভালো হ'ল না চন্দ্রমোহন! বালকেরা সরল মনে একাজ কর্‌লেও

মোদ্দা দোষটায় পাবে আমাদের। ওদের অভিভাবকেরা শুনে হয়ত তুমুল আন্দোলন তুলে দেবেন। সহজে এর জের মিটানো যাবে না।"

চন্দ্রমোহন বাবু অগ্রজের কথা অগ্রাহ্য করিলেন না; এক এক পংক্তিতে এক এক শ্রেণীর বালককে বসাইয়া দিলেন।

আহারান্তে বাড়ী যাইবার কালে ভুবন বিনোদকে বলিল, "আগে বোঝ্‌তে পারিনি যে, এমন অপমান ভোগ কর্‌তে হবে। তা হ'লে এমন নেমন্তন্নে পা দিতাম না।"

বিনোদ বলিল, "কেন, আমাদের জেদই ত বজায় রইল। আমাদের অপমান হ'ল কিসে? বরঞ্চ ওরাই ঠক্‌লো; ঠেক্‌লেও পরে ওরাই ঠেক্‌বে। এক চাঁদোয়ার তলে বসে নীচ জাতের সঙ্গে খেলেও জাত যায়। এ বুদ্ধিটা যে নীরদ-দার মাথায় গজাল না, এ বড় আশ্চর্য্য!"

ভুবন ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, "ওর সব তাতেই বড্ড বাড়াবাড়ি! তা না হ'লে পণ্ডিত-মশাইর বাড়ীতে খেতে হ'বে বলে ভেট সাজায়ে কে আনে!"

৪

শনিবারের সাপ্তাহিক পরীক্ষার কাগজ দিয়া তিনবন্ধুর মধ্যে বলাই সকলের আগে বাহির হইল। সাহিত্যে নীরদের দক্ষতা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও সেও একটু পরেই বাহিরে আসিয়া বলায়ের সহিত প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল এবং ভুবনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বলায়ের সহিত সাহিত্যে আটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া ভুবনের মনে বড়ই দুঃখ; এ পরীক্ষায় তাহাকে পেছনে ফেলিতে হইবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

পণ্ডিত মহাশয় মেয়ের অসুখে বিমর্ষ হওয়ায় আজ ক্লাসের উপর তীব্র নজর রাখেন নাই; তাহার অসুখ-বৃদ্ধির সংবাদ জানিয়া ছাত্রদের সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ভুবন ব্যাকরণখানা খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে সমাসগুলি কাগজে লিখিতেছে। অমনি তিনি তাহার কাণমলা দিয়া হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া গেলেন এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাহার ভাবী অমঙ্গলের কথা জানাইয়া দিলেন। তাঁহার উচ্চবাক্যে বাহিরের ছাত্রগণও চমকিত হইল; ব্যাপারটা কি, সকলেই জানিল। ভুবনের মুখখানা মলিন দেখিয়াও আজ আর নীরদ কি বলাই, কেহই কারণ জিজ্ঞাসা করিল না;

বরং নীরদ বলিল, "চলো, আজ নবীন-দার নেমন্তন্ন, রক্ষা করা যাক্। এখনো ত গাছে বেশ কুল আছে, দু'দিন পরে আর পাওয়াই যাবে না।"

নবীন বলিল, "আজই তবে চলো, ভাই; আজ সকালে কুল পাড়া হয়নি, বৈকালে আমি গিয়ে পাড়্‌বো, বলে এসেছি। আজ গেলে নিশ্চয়ই দু-দুটা করে পাবে, বিমুখ হ'তে হ'বে না। আর আমি আগ ডালের ওপরে ওঠে পাড়্‌তে বড্ড ভয় পাই। ভুবন আর বলাই ওপরের ডালের কুল পেড়ে দেবে।"

নীরদ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তুমিও যে ভাই, আমার মতনই বীর!"

নবীন বলিল, "আমরা ভীরু হ'লেও ভাবনা কিছুই নেই; দুই বীর-পুরুষইত আমাদের সঙ্গে আছেন।"

নীরদ মাথা নীচু করিয়া মাটি হইতে কুল তুলিতেছিল; হঠাৎ একটা বিকট মট-মট শব্দ তাহার কাণে গেল এবং পরক্ষণেই পেছনে ঝুপ্‌ করিয়া একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দে সে শিহরিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া দেখিল, বলাই ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—ভাঙ্গা ডালটী তাহার পিঠের উপরে। বলাইকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নীরদ চেঁচাইয়া বলিল, "ভুবন!—ভাই, এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! শীগ্‌গির নেবে এসো; বলাই বুঝি সকলকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্চে!"

ইহা বলিয়াই নীরদ বলাইকে কোলে তুলিয়া লইল; তখন বলাই অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দে আপনার বেদনা জানাইতেছিল। ভুবন

নামিয়া আসিয়া বলিল, "মরা মানুষকে নিয়ে বসে থাক্‌লে আর কি হবে? বরং ডাক্তারের খোঁজে যাওয়াই ত ভালো।" একথা বলিয়াই সে দৌড়িল এবং নবীনকে ডাকিয়া বলিয়া গেল, "আমি জরুরী কাজে যাচ্ছি, আমার দোয়াত-কলমটা তোমার কাছে নিয়ে রেখো, ভাই। বলাই গাছ থেকে পড়ে গেছে; নীরদ-দা তোমায় ডাক্‌ছে।"

নবীন অকুস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নীরদের চেষ্টায় বলাইর জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহার রুদ্ধ শ্বাসও আস্তে আস্তে বহিতেছিল; কিন্তু তাহার উঠিবার শক্তি ছিল না। নবীনকে কাছে দেখিয়া সে শুধু জিহ্বা নাড়িয়া পিপাসা জানাইল।

নবীন তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে এক ঘটি শীতল জল আনিয়া দিল। জলপান করিয়া বলাই অনেকটা সুস্থ হইল; তারপর সে উপর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ভুবন-দা কোথায় নীরদ-দা?"

ইহার উত্তর নবীন দিল। সে বলিল, "সে বাড়ী গেল জরুরী কাজ আছে বলে! তার আক্কেলটা দেখো একবার!"

বলাই একটী ছোট্ট নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "তার মনে আজ সুখ নেই, স্কুলেও ভাল যায় নি।"

নীরদ দুঃখিত হইয়া বলিল, "ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি বলে, ছল করে যাওয়া কেন? সত্য কথা বলে গেলেই ত হ'ত।

নবীন হাসিয়া বলিল, "চাল-চতুরতাটা তার মাথায় চিরকালই বেশী খেলে। বলাই তারি পাড়া-প্রতিবেশী; আবার সমপাঠী,—

বন্ধুও। বন্ধুর প্রতি বেশ সহানুভূতিটাই দেখান হ'ল! বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা হয় ভালো।"

বলাইর শ্বাস-কষ্ট হইতেছিল। সে বুকে হাত দিয়া বেদনা জানাইলে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি বাড়ী যেতে পারবে, ভাই? আর একটু সুস্থ হয়ে লও; আমরা উভয়ে তোমায় ধরে বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবো।"

বলাই আর গৌণ করিতে চাহিল না; তখনি তিনজনে রওনা হইয়া গেল।

পরের সোমবার বলাই স্কুলে উপস্থিত হয় নাই দেখিয়া নীরদ চিন্তিত হইল এবং ভুবনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলাইর কোনো খবর রাখো কি?"

ভুবন ইহাতে কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না; বলিল, "হাঁ, জানি; সেত বেশ আছে। সামান্য একটু চোট পেয়েছিল বই ত নয়! সে হেটে বাড়ী গেল শুনে, আমি আর তাকে দেখ্‌তে গেলাম্ না।"

এ উত্তরে নীরদ নিশ্চিন্ত হইল না; কারণ বলাই সুস্থ থাকিলে নিশ্চয়ই স্কুলে আসিত। সে দ্বিতীয় শ্রেণীর নন্দকে বাহিরে ডাকিয়া নিয়া বলিল, "হাঁরে নন্দে, তুই ত বলাইদের বাড়ীর ওপর দিয়েই এসেছিস্। সে আজ স্কুলে আসে নি কেন, জানিস্?"

নন্দ গর্ব্বভরে বলিল, "তা বুঝি আর জানিনে! কাল বাবার কাছে শুনেছি, ওনার জ্বর—নেমোনিয়া। কাল সকালে ডাক্তার গিয়েছিলো। আজও ডাক্তার গিয়ে অষুদ দিয়েছেন।"

"কোন ডাক্তারে তাকে দেখেন, তা জানিস্ ?"

"তাও, জানি!—কাল এসেছিলেন কেশব বাবু; আজ সরকারী ডাক্তারও এসেছেন। দু'জনে পরামর্শ করে অষুদ দিয়েছেন।"

নীরদের মুখখানিতে সহসা কে যেন কালি লেপিয়া দিল! সে বিষণ্ণচিত্তে গিয়া হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইল এবং তখনতখনি বলাইকে দেখিতে চলিল। তাহাকে যাইতে দেখিয়া ভুবন বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি নীরদ-দা, অত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্চ ?"

"বলাইর অসুখ বেড়েছে; শোন্‌লাম, সরকারী ডাক্তারকে আনান হয়েছে। তাই দেখ্‌তে যাচ্ছি। চলনা, তুমিও দেখে আস্‌বে।"

"অ্যাঃ! কি বল্‌লে ?—অসুখ বেড়েছে ?—সত্যি! তবে ত গিয়ে একবার দেখা উচিত। আচ্ছা, তুমি এখন যাও; আমি বাড়ী হয়ে পরে যাচ্ছি।"

নীরদ গিয়া দেখিল, সে-গ্রামের ডাক্তার কেশব বাবু বলায়ের-বিছানায় বসিয়া থার্ম্মোমিটার দেখিতেছেন। নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বোঝ্‌ছেন, ডাক্তার-বাবু ?—জ্বরের অবস্থা কিরূপ ?"

"জ্বর আজ আর বাড়্‌বেনা বলেই বোধ হচ্চে। সকালে একশ ছিল, এখনো তাই; কাল্‌কার চেয়ে তিন ডিগ্রী কম। না, ভাব্‌বার কিছুই নয়। বুকের বেদনাটা কম্‌লেই সেরে যাবে; আর সরকারী ডাক্তারকে আন্‌তে হ'বে না। ওনি ত বাড়ীতে পা

দিয়েই নেবেন চার টাকা! আমি পূরোপূরি দু'দিন খাট্‌লেও চার টাকা হাত দিয়ে গল্‌তে চাইবেনা!"

"বুকের বেদনাটা কিসে হ'ল, ঠিক করেছেন?"

"আমি প্রথমতঃ ন্যুমুনিয়াই ভেবেছিলাম; কিন্তু তা নয়। বোধ হয় আগে কোনদিন চোট পেয়েছিল, তা এখন বেড়েছে; সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও এসেছে। সরকারী ডাক্তারও তাই বল্লেন। তা ব্যবস্থা একরূপের হ'লে কি হয়, বাপু? ওনি সরকারী ডাক্তার, ওনার ভিজিট চারটাকা, আর আমি হলাম গাঁয়ের ডাক্তার, আমার ভিজিট একটাকা; তাও সব সময় নগদ নয়!"

"চোটটা শনিবার বৈকালে পেয়েছে—একটু ওপর থেকে নীচে পড়ে গিয়ে; তা আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। এ জ্বরের বেদনা নয় ঠিকই।"

"বোধ হয়, গাছ থেকে ওপুড় হয়ে পড়েছিল; কেমন,—নয় কি?"

"আজ্ঞে হাঁ; পড়ে খুব চোট পেয়েছিল,—অজ্ঞান হয়েছিল।"

ডাক্তার বাবু গোঁফে তা দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ত বল্‌চি, এ রকমের রোগ সারাতে আমার দুদিনের বেশী লাগ্‌বেনা। এ যে কিছুই নয়,—কোনো চিন্তার কারণ নেই, তাই আমি ওদেরে বোঝাতে পার্‌চিনে! কোথায় গেলেন, মণ্ডল-মশাই? আজ তিনটাকা ভিজিট না নিয়ে নড়্‌চিনে। রোগ আমিই সারাবো; সরকারী ডাক্তারকে আর আন্‌তেই দেবোনা! তাকে দেবেন চারটাকা; আমি তিনটাকা নিয়েই খুসি থাক্‌বো।"

নীরদ বিনয়ে বলিল,—"আজ্ঞে, আপনি ওকে বেশ করে সুস্থ করে তুলুন; আপনার টাকার কোনো ভাবনা নেই। যা চাবেন, তাই দেয়া যাবে।"

"তাকি আর আমি জানিনে, বাপু!—মণ্ডল-মশাই ত টাকার কুমীর।"

বলাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পরের সোমবার স্কুলে হাজির হইল। এ কয়দিন সকালে-বৈকালে, দুবেলাই নীরদ তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল; কিন্তু ভুবন বলায়ের বাড়ীর পাশ দিয়া তাহার মাসীর বাড়ী হইতে ফিরিবার কালে বলাইর সহিত হঠাৎ তাহার দেখা হইল এবং বলাইর অসুখ সম্বন্ধে দুই বন্ধুতে তখন অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে ভুবন বলাইকে জানাইল যে, সে তাহার একমাত্র মেসতুত ভাইএর ব্যারামে খুব উদ্বিগ্ন ছিল, তাই সকল সময়ে বলায়ের তত্ত্ব লইতে পারে নাই এবং সে-জন্য সে দুঃখিত। বলাই তাহাকে দুঃখিত হইতে বারণ করিয়া বলিল,—"আহা! বেচারী এখনো সারেনি তবে? সে সেরে ওঠ্‌লেই আমি তার মঙ্গলের জন্যে হরি-লুট দেবো।"

৫

চন্দনপুকুরের উত্তর পারের পথের ধারে যে একটী প্রকাণ্ড বটগাছ এখনো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আতপত্রের ন্যায় আতপ-তাপ নিবারণ পূর্ব্বক সুশীতল ছায়ায় স্থানটীকে শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছে, উহার তলায় বসিয়া তিনটী ছাত্র-বন্ধু নানা গল্প-গুজবে কাল কাটাইতেছিল। স্কুল ছুটী হইলে, নানা প্রকার ক্রীড়া-কুর্দ্দনের পর বিশ্রাম করিবার জন্য এই আরামের স্থানটী ছাত্রগণ অনেক দিন আগেই নির্ব্বাচন করিয়াছিল। আজিও ব্যায়াম-ক্রীড়াদির পর যে কয়টী ছাত্র বৈশাখের অপরাহ্নে সে সুশীতল স্থানে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল, তন্মধ্যে ভুবন বলাইকে কথা বলিতে থামাইয়া দিয়া নিজে বলিল, "তুই যেমন জাতে ছোট, তোর মনটাও তেম্‌নি; তোর ভাবী আশা-ভরসার কথাগুলো ততোধিক। আমি এর পরে কি কর্‌বো, জানিস্‌? আমি কলেজের পড়া শেষ করে হয় মস্ত-বড় হাকিম হ'বো, না হয় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কর্‌বো। মোট কথা, আমি একটা গণ্য-মান্য মানুষ হ'বো, যাতে দেশের আর দশের হিত কর্‌তে পার্‌বো। আচ্ছা, নীরদ-দা, তুমি কি হতে চাও বল দিখিনি।"

নীরদ মলিনমুখে একটীবার বলায়ের শান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিল; পরক্ষণেই মুখ আনত করিয়া বলিল, "তোমার এ

বদ মেজাজটা আর শোধরালো না, ভুবন! তুমি যখন তখন জাত তুলে কথা বল্‌ছ; অথচ তা নেহাত অনাবশ্যক—একেবারেই অকারণ! বামুনজাতের মধ্যেও ব্রহ্মদস্যি জন্মায়, আর হাড়ি-ডোমের ভেতরও সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায়! জাতের নিন্দা করে কিছু বল্‌তে যাওয়া নেহাত আহাম্মুকি, নয় কি?"

বলাই নীরদের কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমিও ভাই, সব বিষয়েই কিছু বেশী বাড়াবাড়ি করে থাকো। এ ত প্রবন্ধ লেখা নয় যে, ব্যাকরণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে অতি সাবধানে শব্দ-প্রয়োগ করতে হবে। ও কিছু নয়; এখন কাজের কথা হোক্। ভুবন-দা ত নেহাত গণ্যমান্য না হয়ে ছাড়্‌বেন না। তোমার মতলবটা কি, তা এখন শোন্‌তে চাই।"

ভুবন একটু মুখভারি করিবার ভাণ করিয়া বলিল, "ঠিক ভাই, এ আমার বদমেজাজই বটে,—আমি হিসাব-কিতাবের কৃত্রিমতার গণ্ডী না ভেঙ্গে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত কথা বল্‌তে জানিনে। দোষ স্বীকার কর্‌লাম; তবু কি ক্ষমার যোগ্য নই? এখন দয়া করে নিজের মনের কথাটা বল্‌তে মর্জ্জি হোক, নীরদ-দা!"

ভুবনের বিদ্রূপ-বাক্য নীরদের নিকট তেমন প্রীতিকর বোধ না হইলেও আবার সে কথাটা না তোলাই সে সঙ্গত বোধ করিল এবং বলাইর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাই, তুমি ত কথা শেষ করনি। আগে যখন তুমি কথা তুলেছ, তখন আগে তোমাকেই বল্‌তে হবে, লেখা-পড়া শিখে কি কর্‌বে।"

বলাইর শান্ত মুখ-মণ্ডল সরল হাসিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; সে বলিল, "নীরোদ-দা সকলের মন্তব্য না শুনে আগে কিছুই বল্‌তে রাজি নন! নীরোদ-দা ওজন করে করে সব কথা বলে থাকেন, যেন কেউ তাঁকে এক তিলও ঠকাতে না পারে। আমার যা বল্‌বার, আগেই প্রায় সব বলেছি; তথাপি শেষ কথাটা না শুনেও যখন নীরোদ-দা কিছুই বল্‌ছেন না, তখন বল্‌ছি, আমি বি, এ, পাশ করেই কোনো কারবার ধর্‌বো; আর কিছু না পারলেও মাছের ব্যবসা ধর্‌তে ছাড়বো না।"

নীরদ প্রফুল্লমুখে বলিল, "বেশ ত!—ব্যবসায়ী হওয়া মোটেই মন্দ নয়। ব্যবসায়েই ত বেশী অর্থ ঘরে আসে। তবে তোমাকে লেখা-পড়া করে আর কিছু মাছের ব্যবসা কর্‌তে হ'বে না, অন্য কোনো বড় রকমের ব্যবসাই ধর্‌তে হবে; সে সুযোগ-সুবিধাও তোমার যথেষ্ট রয়েছে।"

ভুবন এবার দস্তুরমত হাসিয়া বলিল, "নীরদ-দা, এই ত তুমিই বল্‌ছ, মাছের ব্যবসাটা বড় নয়,—ছোট। তার চেয়ে বড় কোনো ব্যবসা বলাইকে ধর্‌তে হবে। আমি যদি বল্‌তাম্, মাছের ব্যবসাটা ছোট, তবেই আমার দোষ হ'ত। কথাটা কি,—আমি যা বলি ঠিক্ সোজাসোজি বলে ফেলি, সাধুভাষার দিকে মোটেই লক্ষ্য করিনে। সে কথাই তুমি খুব মনোরম করে—শিষ্টতার পোষাকে সাজায়ে বলো। যাক্, আমাদের দুজনের কথাই ত পরিষ্কার শোন্‌লে; এখন তোমার মনের কথাটা জান্‌তে পারি কি?"

নীরদ বলিল, "দেখো ভাই-ভুবন! নিন্দে করে আমি কাউকে ছোট বলিনে। কিন্তু তোমার কথায় সে ইঙ্গিতটা বেশ করে ফুটে ওঠে। তা ভাই, তোমায় কিছু অপ্রিয় বলেছি বলে রাগ করো না। জাত তুলে কাউকে কিছু বল্‌তে নেই, শুধু সে কথাই তোমায় জানিয়েছি। ভেবে দেখো, জাতটা মানুষের তৈরী,—পরমেশ্বর তা করেন নি। মানুষের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় কেউ বড়, কেউ বা ছোট হয়ে আছে; মূলতঃ সকলেই একজাতি—মানুষজাতি। জানো ত, এক কালে রাষ্ট্র-শক্তি হাতে ছিল বলে কাজের সুবিধার জন্যে আর্য্যগণ তিনটা বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন ত আমরা সকলে মিলে এক বিরাট শূদ্রজাতি ছাড়া আর কিছুই নই। এখন পর-পদসেবী গোলামের জাতির মুখে সেকালের জাত্যাভিমানের বড় বড় কথাগুলো কিছু ভাল শোনায় না। যাক্ আমিও যাতে তোমারি মতন দেশের না হোক্, দশের সেবা করিতে পারি, তেমনি একটা কিছু কর্‌তে চাই। সেজন্যে আমি চিকিৎসা-ব্যবসার পক্ষপাতী। অবশ্য বি, এ, পাশ কর্‌বার সাধটা আমার মনেও তোমাদের মতনই পূরোপূরি রয়েছে।"

ভুবন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, "বহুত আচ্ছা! আমাদের দু'জনের আশা-আকাঙ্ক্ষাইত এক রকম। কালে আমরা দুজনেই দেশের কাজ কর্‌তে পার্‌বো, নিশ্চয় এবং সেজন্যে আমাদের উভয়ের বন্ধুত্বও থাক্‌বে অটুট।"

ভুবনের আজিকার কুটিল কথাগুলি আগ হইতেই নীরদের ভাল লাগে নাই। তাহার উৎফুল্ল ভাবও নীরদের নিকট বিসদৃশ

ঠেকিল। সে বলিল, "বলাই যদি প্রকৃতপক্ষে মাছের ব্যবসাই ধরে, তথাপি সে দেশের কাজ অন্য কারুর চেয়ে কম করবে বলে ত মনে হয় না। তাহাকে আমি [illegible] জানি; তার হৃদয় কতখানি বড়, তাও সেদিন টের পেয়েছি; তার বন্ধুত্ব যে অটুট থাক্‌বে, আমি তার ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌তে পারি।"

বলাই এ কথায় বড়ই কুণ্ঠিত হইল, বলিল, "দেশের কি দশের সেবার ন্যায় মহৎ কর্ম্ম কর্‌বার স্পর্দ্ধা কর্‌তে পারি, তেমন আমার কিছুই যোগ্যতা নেই। সে কাজের ভার তোমরা নিচ্ছ, তোমাদের ওপরেই রইল, ভাই। আর নীরোদ-দা, তুমি ঠেকে না হয় সেদিন কয়টাকা ধার নিয়েছ; তা অত বড় করে প্রচার কর্‌তে যাওয়া বন্ধুর কাজ নয়। আমার হাতে টাকা ছিল বলেই ত আমি দিয়েছি; ভুবন-দার হাতে সম্ভবতঃ ছিলনা, তাই দিতে পারে নি।"

ভুবন বলিল, "ঠিক বলেছো, বলাই,—ঠিক বলেছো। বন্ধুর সাহায্য কর্‌লে তাতে বন্ধুর পক্ষে যশের কথা কি, আর না কর্‌তে পার্‌লেই বা অযশ কি?"

নীরদ বলায়ের কথার উত্তর দিতে গিয়া বলিল, "শত্রু হোক্‌, মিত্র হোক্‌, উপকার যার কাছ থেকেই আসুক না কেন, উপকার পেলে চিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে মুখদিয়ে কৃতজ্ঞতার কথা বেরোয়। বন্ধুর মুখে কি তা হতে নেই না কি? বন্ধু কি মানুষ ছাড়া আর কোন জীব?

ভুবনও তাহার প্রতি-উত্তর করিতে ছাড়িল না; বলিল, "আমার ভাই, ভাবের অতটা বাড়াবাড়ি নেই, কৃতজ্ঞতারও ছড়া-

ছড়ি নেই। আজ তবে এখানেই থাক্। ঐ দেখো, সূর্য্যি-মামা ডুবু-ডুবু হচ্চেন, আর দেরী করা চলে না।”

বলিয়াই ভুবন খাতা-পুস্তক হাতে তুলিয়া লইল। কাজেই নীরদ ও বলাইকেও তাহাই করিতে হইল। তিনবন্ধু বাড়ীর পথ ধরিয়া কিছুদূর একত্র গেল; তৎপর নীরদ বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলে অন্য দুইজন প্রতাপপুরের দিকে গমন করিল।

৬

কালাচাঁদ মণ্ডল বাল্যকালে তাঁহার পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মাছের ব্যবসায় করিলেও এখন আর তিনি তাহা করেন না। তাঁহার পিতা যে সব জমি-জিরাত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বৎসরে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় হয়; মহাজনীর আয় আরও বেশী, প্রায় সাত হাজার। অতি অল্প সুদে টাকা ঋণ দেন বলিয়া লোকে আগে তাঁহার নিকটেই আসে এবং ক্বচিৎ দুই-একটী অসৎ লোক ছাড়া অন্য কেহ তাঁহার টাকা শোধ করিয়া দিতে কখনও অনিচ্ছুক হয় নাই।

লোকে নেহাত ঠেকিয়াই কালীমোহন বাবু হইতে বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে যায় এবং সেজন্য তাহাকে ঠকাইতেও চায়। টাকা আদায়ের জন্য কালীমোহন বাবুকে প্রায়ই মামলা করিতে হয়,

সেজন্য লোকসান ও ঝঞ্ঝাট বেশী হয়। কালাচাঁদ মণ্ডলের টাকা খুব সহজে আদায় হয় বলিয়া কালীমোহন বাবু তাহাকে নিতান্ত ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতেন এবং জেলে-জোলার ঘর হইতে টাকা নিয়া কোন কাজ করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এ হিতোপদেশও সর্ব্বদা প্রচার করিতেন। ঈর্ষ্যার ভাবটা অবশেষে পুরুষানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইল ; ভুবনও কালাচাঁদ আব তাঁহার পুত্রদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বলাই তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু বলিয়া তাহার নিকট প্রকাশ্যে মনোভাব গোপন করিতে হইত, কিন্তু অন্তরাত্মার অন্তরালে সে দুষ্ট ভাব ভালরূপেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

আজ আবার নন্দনপুর মধ্য-ইংরেজী স্কুলের ঐ তিনটী ছাত্র স্কুল ছুটীর পর চন্দনপুকুরের পারের বটগাছের ছায়ায় বসিয়া কথোপ-কথন আরম্ভ করিল। অল্পকাল পরে বলাই হঠাৎ উপর দিকে তাকাইয়া বলিল, "বায়ু-কোণে মেঘ কর্‌লে ঝড় না এসে যায় না! উঃ! কি ভীষণ কালোমেঘ! আর না,—চলো—শীগ্‌গির চলো। কালবৈশাখীর ঝড় আস্‌তে আর বড় দেরী নাই!"

নীরদ আর ভুবনও মাথা তুলিয়া সে কাল মেঘ-খণ্ড দেখিল এবং তিন বন্ধু খাতা-পুস্তক হাতে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। নীরদদের বাড়ীর কাছে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই হু-হু শব্দে প্রচণ্ডবেগে ঝড় আসিল, তিনবন্ধু দৌড়িয়া হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বহিরঙ্গনে উপস্থিত হইল। ভুবন ও বলাইকে বাহিরের ঘরে বসিতে বলিয়া নীরদ ভিতরে ঢুকিল এবং তখন তখনি ঝর-ঝর করিয়া মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। শুধু বর্ষণ

নয়, গর্জ্জনও হইতেছিল ভয়ঙ্কর; ভয়ে নীরদ আর বাহির হইতে পারিল না। প্রায় আধঘণ্টা পরে জলের ফোঁটা কিছু পাত্‌লা হইলে নীরদ ছাতা লইয়া বাহির হইল এবং বাহিরের ঘরে ঢুকিবার কালে বলিতেছিল, "কি চোটের বর্ষণ! যেন···"। তখন সে যে একটী ঘটনায় থামিয়া গেল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন শূলের ঘায় বিদ্ধ হইয়া গেল! সে দেখিল, ভুবন চেয়ারে বসিয়া বেঞ্চের-উপরে-বসা বলাইয়ের সহিত কি কথা-বার্ত্তায় হাস্য-পরিহাস করিতেছে। ভুবনের এ আমীরি চালটা তাহার চক্ষে বিষম অশিষ্টতার আকার ধারণ করিল, তাই তাহার মুখখানি কাল হইয়া গেল! তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অপর দুই বন্ধুর কথোপকথন বন্ধ হইল, তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। নীরদ বলাইকে বলিল, "তুমি বেঞ্চে কেন, ভাই? —এ তক্তপোষটাও ত রয়েছে।" বলিয়াই সে বলাইকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের পাশে তক্তপোশের উপর বসাইল। ভুবন চেয়ারে বসা আর সঙ্গত বোধ করিল না, একটু লজ্জিত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া তাহাদের কাছে গিয়া বসিল।

মিনিট দুই তিন নীরবে কাটিবার পর সে অশোভন নিস্তব্ধতাটা ভঙ্গ করিবার জন্য নীরদই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, "বাপ্‌রে বাপ্! যেমন ঝড়, তেমনি জল! ভাগ্যি যে, বাড়ী এসে পৌঁছা গেছে, পথে থাক্‌লে কি বিপদই না জানি, ঘট্‌তো।"

বলাই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি ত বাড়ী এসে পৌঁছেছ, তোমার বিপদটা কেটে গেছে। কিন্তু আমাদের বাড়ী যাওয়ার ভাবনাটা ত এখনো ঘোচেনি।"

ভুবন বলিল, "কেন, আমরা ত বন্ধুর বাড়ীতেই রয়েছি, আমাদেরই বা ভাবনার কথা কি?"

নীরদ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে যে, তোমরা বন্ধু বলে সত্য সত্যই দয়া কর্‌বে। তোমাদের সহিত একত্র আহার-বিহারে কত যে আরাম পাই, তা বল্‌বার নয়, ভাই!"

ভুবন হাসিয়া বলিল, "বটে! আমার সঙ্গে না হয় এক স্থানে বসে আহার কর্‌লে, আমি আর কিছু অচল জাত নই; কিন্তু বলায়ের সঙ্গে তা কি করে হবে হে? তোমরা ত ব্রাহ্ম পরিবারের লোক নও। তোমার বাবা যে খাঁটি হিন্দু; একেবারে গোঁড়া ভট্‌চার্য্যি বামুন—টোলের পণ্ডিত!"

নীরদ বলিল, "বাবা পণ্ডিত বলেই আমি এ ভরসা কর্‌তে পারি যে, তিনি কখনই এক স্থানে বসে খেতে আমাদের বারণ কর্‌বেন না। আমরা ছুটীর পর চিড়া-মুড়ি ফল-ফলারি কাড়াকাড়ি করে খেতে পারি, আর এক স্থানে বসে ভাত খেতে পার্‌বো না? আমি বাবাকে ভালরূপেই জানি; তিনি কোন দিনই সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেন না! আচ্ছা তোমরা দয়া করে থাকো না একবার; আমি বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে বোঝাপড়া করে নেব।"

ভুবন বিস্ময়-বিদ্রূপের সুরে বলিল, "তোমার বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌বে? তবেই হয়েছে! আজ রাত্তিরে এখানে

থাক্‌লে কার ভাগ্যে কি জোট্‌বে, তা আগেই অনুমান করা যেতে পারে। আচ্ছা, নীরদ-দা, তুমি আগে তোমার বাবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করো, তার পরে না হয় আর একদিন ভোজটা হবে। এখন জল-পড়া ত থেমে গেছে; আজ আর আমাদের বাড়ী যাবার কোন কষ্টই হ'বে না। কি বলো বলাই,—তোমার মতটা শোন্‌তে পারি কি?"

বলাই বলিল, "হাঁ ভাই, আমায় বাড়ী যেতেই হবে; বৃষ্টি থাক্‌লেও না গিয়ে রক্ষা নেই! একটু আঁধার হলেই সেদিনকার মত খোঁজ কর্‌তে বাবা লোক পাঠাবেন। নীরোদ-দা, এরূপ অপ্রিয় আলোচনা তুমি কখনই বাবার সঙ্গে করো না। সামাজিক প্রথায় ছোট বড় সব দেশে সব কালেই রয়েচে, থাক্‌বেও। তার ব্যতিক্রম কর্‌লে সমাজ টিকে কৈ? তোমরা সমাজের মাথা হয়ে যদি সমাজের আট-ঘাট ভাঙ্গতে চাও, তবে তার ফল নিতান্ত অশুভই হবে। শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন আপনা-আপনি হয়ে থাকে, জোর করে তা কর্‌তে গেলে বড্ড অনিষ্টই হবে। আর সমাজে জোর করে কেউ কোনো নতুন মত চালাতে গেলে, তা কখনই স্থায়ী হতে পারে না।"

ভুবন সবিদ্রূপ হাসিয়া বলিল, "স্থায়ী হতে পারে না!—কি বল্‌চো, বলাই? আমরা যখন ইংরাজী বইর দু'পাতা পড়েছি, তখন আমরাই যা খুশী, মত দিতে পারি। বুড়োরা ত সেকেলে মূর্খ্য—নেহাত বোকা আর হাবা! তাদের কথা আবার শোনে কে? কেমন, নয় কি নীরদ-দা?

নীরদের বক্ষ হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস সরিয়া গেল; সে বলিল, "আমি ভাই, বুড়োদেরে কখনো মন্দ বলিনে, আর পুস্তকের দু'পাতা পড়েই জ্ঞানী হ'বার স্পর্দ্ধা করিনে। আমাদের হিন্দু-সমাজটা যে নানা গণ্ডীতে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়ে রয়েছে, ছোঁয়া-ছোঁয়ির বাড়াবাড়ি বলে মেলামেশাটা কম হচ্চে, এটাত মিথ্যে মোটেই নয়, ভুবন! ছুঁলে-ধর্‌লেই জাত যায়, কি ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এটা যে ধর্ম্মের গোড়ার কথা নয়, তা যে কোনো ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই বোঝেন; কিন্তু বুঝেও যে সমাজের ভয়ে সে বোঝাকে অগ্রাহ্য করা হয়,—অনায়াসে সত্যের অপলাপ করা হয়, এটাইত যার-পর-নাই ক্ষোভের কথা, ভাই। এ হেয়, ও ছোট, সে ঘৃণিত,—এ করে করেই হিন্দুদের কয়েকটী সম্প্রদায় অন্য সকলকে নিয়ত অপদস্থ কর্‌ছে, আর বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে! ঘৃণিত কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট ভেবে আমরা মানুষকে অবজ্ঞা কর্‌ছি আর ছোঁয়োনা-ছোঁয়োনা বলে ঠেলে দূর করে দিচ্ছি! এর ফল কি হচ্চে? পরস্পরের প্রতি মনের যেরূপ টান থাকা উচিত, তা আর নেই;—সাহায্য-সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব! আরো দেখো, লুকায়ে গর্হিত কিছু কর্‌লেও দোষ নেই, দোষ হচ্চে জানাজানিতে! জান্‌লেই গুরুতর প্রাচিত্তির ভোগ কর্‌তে হয়, না জান্‌লে কিছুই নয়! এ মিথ্যে অভিনয় যতই বাড়্‌বে, ততই সমাজ দুর্ব্বল আর পঙ্গু হয়ে ভোগ্‌বে। সত্য আমাদের কাছে উপেক্ষিত হয় বলেই ত আমরা সর্ব্বদা আত্ম-গোপন করে চল্‌ছি, আত্মার অবমাননাকর কাজ কর্‌ছি, আর দিন দিন পর-পদাঘাত অনায়াসে হজম কর্‌ছি;—

আমরা কি আবার মানুষ? কুসংস্কার-কুহেলিকা সরায়ে না দিলে ধর্ম্মের আসল জ্যোতির বিকাশ হয় না—ধর্ম্মের স্বরূপটা ঠিক ঠিক ধরা যায় না। যেটা সব দিক দিয়ে সত্য, সেটাইত প্রকৃত ধর্ম্ম। সমাজের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে আমরা যে শুধু ধর্ম্ম নষ্ট করছি, তা নয়; আমাদের নিজেদের অস্তিত্বও হারাতে বসেছি! হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন কেন কমে যাচ্ছে, তাও ভাব্‌বার একটা বিষয়।"

ক্ষণকাল সকলেই নীরব রহিল, পরে ভুবন ব্যঙ্গ-ভরা ভাষায় বলিল, "বেশত, তুমি ধর্ম্ম-সংস্কার করে দেশোদ্ধার করো, তোমার মত যোগ্য ব্যক্তিকেই সে কাজে মানাবে ভালো। আমাদের মতো চুনো-পুঁটির ও কাজ নয়; তা শোন্‌লেও পিলে চম্‌কে ওঠে।

নীরদ এবার ছাড়িল না, সেও একটু উপহাসের সুরে বলিল, "সত্যকে যদি আঁক্‌ড়িয়ে ধর্‌তেই না পারো, তবে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ কি বারিষ্টার হয়ে দেশের আর দশের কাজ কর্‌তে চাও কোন মুখে? আর দেখ্‌ছি, তুমি হিন্দুমতেই বিলাত-যাত্রা করে স্বধর্ম্ম রক্ষা করবে!"

ভুবন একগাল হাসিয়া বলিল, "কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যা ঘট্‌বার তা পরে ঘট্‌বে; এখন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি প্রয়োজন? না ভাই, এখন বিদায় হচ্ছি,—রাত যে হ'লো।" বলিয়াই সে খাতা-পুস্তক হাতে লইয়া ঘরের বাহির হইল; বলাইও তাহার অনুসরণ করিল। বলাই যাইবার কালে শুধু বলিল, "বড়

সমস্যার কথা ভাই ;—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং ; মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' আমরা ছেলে মানুষ, ধর্ম্ম নিয়ে নাড়া-চাড়া করা কি আমাদের সাজে ?"

বন্ধুদ্বয় চলিয়া গেলে নীরদ সেখানে বসিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল, তারপর আপনা আপনি বলিল, "হে সত্য-স্বরূপ! সত্যের জ্যোতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ করো, মনের আঁধার ঘুচায়ে সত্য পথটী দেখাও—মুমূর্ষুকে বাঁচাও।"

৭

শ্রাবণ মাস ; টিপ-টিপ করিয়া সারাদিন বৃষ্টি পড়িয়াছে। পথে কাদা ; কাদায় বক্সীবাড়ীর কোণের বাঁশের সাঁকোটি ভয়ানক পিচ্ছিল হইয়াছে। স্কুল ছুটির পর নিম্ন শ্রেণীর ছেলেরা আগে চলিয়া গিয়াছে ; তাহাদের পায়ের কাদায় উহা আরও পিচ্ছিল—একেবারে তেলতেলে হইয়াছে। ভুবন পুলে উঠিয়া কয়েক পা মাত্র গিয়াছে, এমন সময় সে পা পিছ্লাইয়া কাত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের টানে হাতে-ধরা পুরাতন সরু বাঁশটাও ভাঙ্গিয়া গেল। সে আপনাকে কিছুতেই আর স্থির রাখিতে পারিল না, ঝুপ্ করিয়া খালের মাঝখানে পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিল, "মাগো!—মলুম্‌গো!—রক্ষা কর গো!" ভুবন সাঁতার জানিত

না ; জলে পড়িয়াই ডুবিয়া গেল। তাহার খাতা-পুস্তকগুলি স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিল।

বলাই ছিল তাহার পেছনে,—অল্প দূরে। সে পিচ্ছিল বাঁশের উপর দিয়া পা চালাইবার গুরুতর পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত হইয়া হাঁ করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল,—যেন একেবারে হতভম্ব! এদিকে, পুলের গোড়া হইতে নীরদ চেঁচাইল, "ভুবন কি তবে তলিয়ে গেল ?—আর উঠ্‌লো না যে !"

তাহাতেই বলাইয়ের জড়তা কাটিল, সে হাতের খাতা-পুস্তকগুলি পারের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল এবং যে দিকে স্রোত চলিয়াছে, সে দিকে ডুব দিল। দুই কি আড়াই মিনিট পরে বলাই ভাসিয়া উঠিয়া শ্বাস বদলাইল এবং তখনি আবার ডুব দিল। নীরদ হতাশে বলিতেছিল, 'কি ভাই, ভুবনের খোঁজ হ'ল কি ?' কিন্তু সে কথা তাহার কাণে গেল না, কিম্বা শুনিলেও কোন জবাব দিল না। বলাই আবার ভাসিল, আবার ডুবিল ;—এইরূপে তিন চারিবার ভাসা-ডোবা করাতেও যখন ভুবনের সন্ধান মিলিল না, তখন নীরদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। কিন্তু বলাই তখন-তখনি ভাসিয়া বলিল, "ও কি কর্‌ছো নীরোদ-দা ? তুমি যে সাঁতার জানো না ! থামো—থামো, —ও ছোট নৌকটা নিয়ে শীগ্‌গির এদিকে এসো।"

নীরদ ভরসা পাইয়া আর জলে ঝাঁপাইল না, নৌকা আনিতে গেল। নৌকা লইয়া আসিতে আসিতে বলাই আরও

তিনবার ভাসা-ডোবা করিয়া বাম হাতে একটা গাছের ডাল চাপিয়া ধরিয়া শ্বাস ফিরাইতে লাগিল, আর ডান হাতে ভুবনের হাত ধরিয়া তাহাকে কোনমতে স্রোতের বেগ হইতে টানিয়া রাখিল। নৌকা কাছে আসিলে সে ডাল ছাড়িয়া দিয়া নৌকার পাঁজর চাপিয়া ধরিল এবং নীরদকে বলিল, "খুব আস্তে আস্তে!—সাবধান! নৌক কাতহলে কিন্তু রক্ষা নেই,—তুমিও পড়ে ডুবে যাবে!"

যে বিপদ হইতে নীরদকে সাবধান করা হইল, তাহাই ঘটিল; ভীত নীরদের পা টলিতে থাকায় নৌকাখানি কাঁপিয়া কাত হইয়া গেল। তখন উভয়ে নিমজ্জিত নৌকার ভাসমান ছই চাপিয়া ধরিল, তাই ডুবিল না; কিন্তু আবার ছইসহ স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিল। ভয়ে নীরদ ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া উঠিল,—"মলুম্ গো!—রক্ষা কর গো!—কে আছ গো!—রক্ষা কর গো!" তাহার চিৎকার শুনিয়া বক্সী বাড়া হইতে তিনটী লোক ছুটিয়া আসিল; তাহাদের কোলাহলে আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিল। তাহারা তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া ভুবন আর নীরদকে উপরে উঠাইল, বলাই নিজেই সাঁতার কাটিয়া উঠিল।

ভুবনের সংজ্ঞা ছিল না;—উদর স্ফীত, মুখ বিবর্ণ, হাত পা শিথিল। দেখিয়া নীরদ ত কাঁদিয়াই উঠিল, বলাইয়েরও চক্ষুও ছল-ছল! উপস্থিত লোকেরা ভুবনকে উপরে তুলিয়া নাড়া-চাড়া করাতে তাহার নাক-মুখ দিয়া অনেকটা জল সরিয়া গেল; তাহাতেই

তাহার শ্বাস বহিল এবং ক্ষণকাল পরেই সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কালীমোহন বাবুকে আগেই খবর দেওয়া হইয়াছিল ; তিনি আসিয়া দেখিলেন, ভুবন বক্সী বাড়ীর বাহিরের ঘরের তক্ত-পোষের উপর শয়ান।

পরদিন বেলা সাতটার সময় বলাই যখন ভুবনের খবর লইয়া শ্রীরামদির ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল, তখন পথে সে গ্রামের করিমবক্সের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। বলাই তাহাকে বলিল, "আমার যেতে একটু দেরী হ'ল, করিম-ভাই। নীরোদ-দার ত কোনো অসুখ-টসুখ করেনি ?"

"হাঁ, শোন্‌লাম, অসুখ করেছে,—জ্বর হয়েছে। এসেছ যখন, চলোনা,—একবার দেখে আসা যাক্।"

"আমি ত তাঁকে দেখ্‌তে পাবো না, করিম-ভাই। নীরোদ-দা রয়েছেন ভেতরে। বামুন-কায়েতের বাড়ীর ভেতরে যেতে আমাদের মানা আছে, তা বুঝি তুমি জানো না ? নীরোদ-দার পিসী-মা যে যেতে বাধা দেবেন।"

"বাঃ! সে ত আমাদের সতীর্থ-বন্ধু ; তাকে দেখ্‌তে ভেতরে যেতে তিনি বাধা দেবেন কেন ? না ভাই, চলো ; ও মানা-টানা মানা হ'বে না। আমরা নীরোদ-দাকে না দেখে ছাড়্‌বো না।"

"কি করে তা হ'বে ?—পাগল আর কি ! হিন্দুদের সকল জাতে যে সকল জাতের বাড়ীর ভেতরে ইচ্ছে কর্‌লেই যেতে পারে না, তা বুঝি তুমি জানো না ?"

"কি জানি, ভাই! তোমাদের হিন্দুদের ভেতরে জাতের বিচার নিয়ে যত সব খুটিনাটির কথা খালি বইতেই পড়েছি, চোখে ত কখনও দেখিনি। আজ না হয় তা চাক্ষুষ করা যাবে; চলো না একবার!"—বলিয়াই করিম বলাইয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে এক- প্রকার জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া গেল।

উভয়ে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর বহিরঙ্গনে দাঁড়াইয়া খবর দিলে একটু পরেই নীরদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—অনিলবরণ আসিয়া করিমকে বলিল, "চলুন্ আপনি, পিসী-মা যেতে বলেছেন। আপনি ত আমাদের মজিদ-চাচার বেটা; নয় কি?"

"তুমি নীরোদ-দাকে গিয়ে বলো, বলাই-বাবু সঙ্গে আছেন, ওনিও দেখা কর্তে চান।"

"পিসী-মা বল্লেন, ও ত ভেতরে যেতে পার্বেনা,—জাতে ছোট। সে দিনও ত তিনি ওকে যেতে দেন নি।"

"ছি! অনিল; ওনি তোমার বড় ভাইয়ের বন্ধু, বয়সে অনেক বড়, পড়া-শুনায়ও ঢের বেশী; তুমি ওঁকে তুচ্ছ করে কথা বল্তে লজ্জা কর্ছে না?"

অনিল থতমত খাইয়া বলিল, "আমি তবে দাদাকে বলে আস্ছি। আপনারা দয়া করে ওঘরে খানিক বসুন।"

করিম শান্তভাবে বলিল, "সেজন্যে তোমাকে মোটেই ভাব্তে হবে না। অনিল, তোমার বাবা কি বাড়ী আছেন?"

অনিল বলিল, "না, তিনি কাল সকালে সহরে গেছেন।"

করিম ও বলাই পরক্ষণেই শুনিল, ভিতরে নীরদের সহিত তাহার বিধবা পিসী-মার বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। পিসী-মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতেছেন, "কি আস্পর্দ্ধা! ছোট জাতের লোকে এসে ঢোক্‌বে বামুনের বাড়ীর ভেতরে! যার ছায়া মাড়ালে চান কর্‌তে হয়, সে কিছুতেই ভেতরে আসতে পার্‌বে না। এ বাড়ীতে এসে চান করে করেই মর্‌তে হবে, দেখ্‌চি। কাল অনিলের ছোঁয়া ভাত মাড়ায়ে চান কর্‌লাম, আজ আবার কোন ছোট জাতের ছায়া মাড়ায়ে কর্‌তে হ'বে!"

নীরদ আর্ত্তস্বরে বলিল, "পিসী-মা, একটু আস্তে কথা বলো না। বলাইকে ছোট বলে নিন্দে করো না। বামুনের ঘরেও তার মত বড় কম জন্মায়। সে পরের জন্যে অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। সে মানুষ নয়—দেবতা।"

পিসীমা আর একটু সুর চড়াইয়া বলিল,—"তোর মাথায় বিকার ঢুকেচে, তুই চুপ্‌ কর্‌ না। যারে অনিল, বল্‌গে ওদেরে —নীরদের অসুখ বেড়েছে, এখন দেখা-টেখা হবে না।"

নীরদ আরও কাতর কণ্ঠে বলিল, "ছি! পিসী-মা, অনিলকে মিছে কথা শিখায়ো না! ওদের ভেতরে আস্‌তে দাও।"

পিসীমার স্বর তথাপি নীচু হইল না; তিনি বলিলেন, "তা কখনই হ'বে না। ও বজ্জাত এসেছে বামুনের জাত মার্‌তে। না হ'লে ও তিন পাড়া ডিঙ্গিয়ে আস্‌বার প্রয়োজনটা কি, শুনি? এটা খিরিষ্টানের বাড়ী নয় যে, যার যা খুশী, তাই কর্‌বে।

আমি জেলের ছেলেকে কিছুতেই আমার ঘরের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢোক্‌তে দেবো না।"

নীরদ এবার বড়ই দুঃখিত হইল, তথাপি ধৈর্য্য হারাইল না। সে বিনয়ে বলিল, "পিসী-মা তুমি কেন অমন বাড়াবাড়ি করছ? বলাই আমার বন্ধু, ওকে আস্‌তে দাও। ও বরং তোমার কাছে যাবে না, এখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে। তথাপি ওকে আস্‌তে দাও। আমার এ কথাটা রাখো।"

পিসীমা ঘাড় নাচাইয়া উচ্চৈঃস্বরেই বলিল, "তোর বন্ধু আর বান্ধবের মন রাখ্‌তে গিয়ে কি জাত দিতে হবে নাকি? বন্ধু হলে আবার জাত মার্‌তে চায় কেন? তুই এখন রোগী, রোগের তাড়নায় যা তা বক্‌ছিস্। তোর এখন মাথা কিছু ঠিক নেই, তোর কথা শুন্‌বো কেন? দাদা যখন বাড়ীতে নেই, তখন আমাকেই ত সবদিক দেখ্‌তে হবে। ছোট জাতকে বাড়ীর ভেতরে আস্‌তে দিয়ে তোদের চৌদ্দ পুরুষ নরকে ফেল্‌বো না কি?"

নীরদের মাতা সত্যবতী ঘাট হইতে তাহার আর তাহার পিসীমার বাক্-বিতণ্ডা শুনিয়া তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে উভয় পক্ষের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি শান্ত স্বরে বলিলেন, "তিনি বাড়ীতে থাক্‌লেও এতে বারণ কর্‌তেন না, ঠাকুর-ঝি! নীরদের বন্ধুরা ভেতরে এসে তাকে দেখ্‌বে, এতে জাত খোয়াবার কথা হ'ল কি? আর তাতে চৌদ্দ পুরুষই বা নরকে যাবে কেন?"

ঠাকুর-ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—"নরকে যাবে কেন ?—অনাচার করলে নরকে যাবে না, ত স্বর্গে যাবে নাকি ?"

সত্যবতী ক্ষুব্ধ-চিত্তে বলিল,"সব তাতেই তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি, ঠাকুর-ঝি !—এ কি রকম !"

"অত চোটের কথা কেন গো তোমার বৌ-দি !"—বলিয়াই ঠাকুর-ঝি উচ্চ-বিলাপের স্বরে চেঁচাইয়া আবার বলিতে লাগিল, "মাগো, তুমি এ কালামুখীকে ছেড়ে কোথা র'লে গো !—বাবাগো, তোমার বাড়ী এসে আজ অপমানের একশেষ হ'লো গো !"

ঠাকুর-ঝির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখে আর কথা সরিল না ; সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু ঝরিয়া ধরাতল প্লাবিত হইল !

তখন নীরদ একান্ত দুঃখিত চিত্তে অনিলকে বলিল, "তুই গিয়ে বলাই আর করিমকে বলে আয়, 'পশু দেবতা বোঝেনা বলেই মূর্ত্তির গায়ে পা দিতে শঙ্কা করে না। দেবতা পশুর সে অপরাধ ধরে না, তাই পশুর সহিত শত্রুতাও করে না' ;—আজ আমি রোগে পড়ে এ সত্যটা ভালরূপেই বুঝেছি।"

অনিল ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সে কথা চিন্তা করিল ; তারপর বহির্ব্বাটীতে গিয়া দেখিল, বলাই আর করিম হাত-ধরাধরি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে সেখানে গিয়াও ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

৮

যেরূপ চাওয়া যায়, কয়জনে সেরূপ পায়? পাইলে সংসারকে মরীচিকা বলা হইতনা, আর আশাকেও মায়াবিনী বলিয়া কবিরা নিন্দা করিতে পারিতেন না। তিনবন্ধুর ছাড়া-ছাড়িটা বড় অপ্রীতিকর হইবে ভাবিয়া তাহারা নন্দনপুর-স্কুলের পড়া শেষ করিবার পর নিজ নিজ অভিভাবককে স্বীকৃত করাইয়া পরম উৎসাহে সদরের এক প্রাইভেট হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এক বৎসর পরেই একে অন্যকে ছাড়িয়া যাইতে হইল। এক জন গেল পাড়াগাঁয়ের স্কুলে, এক জন গেল ভিন্ন জেলার জেলা স্কুলে, কেবল এক জন রহিল সাবেক স্কুলে। তখন শুধু চিঠি-পত্র দ্বারাই তিনবন্ধুর মনোভাবের বিনিময় হইত এবং গ্রীষ্মাবকাশ, পূজার ছুটী প্রভৃতি দীর্ঘ দিনের বন্ধে স্বদেশে তিনবন্ধুর মিলন ঘটিত।

আর তিনবন্ধু চন্দনপুকুরের ধারের বটগাছের তলায় বসিয়া ভাবী জীবনের যে সুখময় চিত্র মনে মনে অঙ্কণ করিয়াছিল, তাহাও স্বপ্নের মতই শেষে ঠেকিয়াছিল। কারণ সে কল্পনা আর বাস্তব হইয়া উঠে নাই। কলিকাতায় নীরদ বি, এ, পড়া আরম্ভ করিবার অল্প কিছু দিন পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল; সুতরাং সংসারের চাপে সে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পড়া-শুনা প্রায় বন্ধ হইতে-ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটা উপায় হইয়া গেল। নারায়ণ কাঞ্জিলাল নামে তাহার এক মেসতুত ভাই কলিকাতায় সওদাগরী

আফিসে চাকুরী পাওয়ায় তাহার খোরাক বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় কলেজের বেতনও অর্দ্ধেক হইয়াছিল। তিনি আগে যে কলেজে পড়িতেন, সে কলেজের এক সিনিয়র প্রফেসরকে ধরিয়া তিনি অর্দ্ধ-ফ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

নীরদ কোনমতে বি, এ, পাশ করিল এবং অঙ্কে অনারস পাইল। কিন্তু পড়া এখানেই বন্ধ হইল। ডাক্তারি পড়িবার সঙ্কল্প তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল; সে দেশে গিয়া নন্দনপুরের মধ্য ইংরাজি স্কুলটীকে হাই স্কুলে পরিণত করিল এবং সংসার চালাইবার জন্য সামান্য কিছু পারিশ্রমিক নিয়া হেড্ মাষ্টারের কাজ করিতে লাগিল। নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, অধ্যাপক সতীশবাবুই তাহাকে এ বুদ্ধি দিয়াছিলেন; তাই সে দেশের যুবকগণকে কাজে নামাইবার জন্য এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন।

বলাইয়ের কৈশোর স্বপ্ন আরও অলীক বোধ হইয়াছিল। সে সদরের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছিল ভালই—প্রথম বিভাগে; কিন্তু এফ, এ, পড়িবার কালে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়া তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট করিল এবং কোন মতে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। তারপরও দুইবৎসর তাহাকে ভুগিতে হইল; এ সময়টা সে বাড়ীতেই কাটাইল। পরে রোগ কমিলেও তাহার পিতা আর তাহাকে বিদেশে যাইতে দিলেন না; সুতরাং তাহার বি, এ, পড়াও হইল না।

ভুবনের অবস্থা দাঁড়াইল অন্যরূপ। সে পড়া-শুনায় তেমন উন্নতি করিতে পারিল না। জেলা স্কুলে পড়িলেও এণ্ট্রেন্স পাশ করিল দ্বিতীয় বিভাগে, এফ-এ পাশ করিল দ্বিতীয় বারে এবং বি-এ

পাশ করিল একবারেই ; কিন্তু কোন বিষয়েই ভাল নম্বর উঠিল না। সে অবশেষে কলিকাতায় আইন পড়িয়া পরীক্ষা দিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সুতরাং তাহার হাকিমী কি ব্যারিষ্টারী করিবার কল্পনাও অবশেষে আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়াছিল।

নীরদ যখন হাই স্কুলের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ভুবন কলিকাতায় বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নীরদের চিঠির উত্তরে সে সংক্ষেপে এই মাত্র লিখিল, 'ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানিবে। আপাততঃ বলাইকে নিয়াই কাজ চালাও ; আমি পরীক্ষার পর যথাসাধ্য খাটিব এবং ঘরের জন্য চাঁদা আদায় করিতে চেষ্টা করিব। লাইব্রেরীর জন্য ভাবনা কি ? আমাদের সাবেক লাইব্রেরীর বইর সংখ্যা হাজারের উপর ; সেগুলো স্কুল-লাইব্রেরীতে দেওয়া যাইতে পারে। আমি বাবাকে বলিয়া সরঞ্জামের জন্য কিছু টাকা দিতে চেষ্টা করিব ; এখন বলাইর বাবার দেওয়া পাঁচশ দিয়াই এখন কাজ আরম্ভ কর।'

বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ভুবন বাড়ী আসিয়া জানিল, স্কুল নিয়া দেশে খুব দলাদলি চলিতেছে এবং তাহার পিতাই কেন্দ্রে থাকিয়া উহা চালাইতেছেন। বলাইকে স্কুলে কাজ করিতে দেওয়ায় তাঁহার ঘোর আপত্তি ; কারণ ছোট লোকের নিকট বামুন-কায়েতের ছেলেরা পড়িতে গেলে মান থাকেনা, ইহাই তাঁহার যুক্তি। ফলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-কায়স্থই এ সুযুক্তির বলে তাঁহার দলে গিয়া স্কুলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল।

কালীমোহন বাবু খুব হিসাবী বলিয়াই হুসিয়ার, চাল প্রয়োগে সে অঞ্চলে তাঁহার মত আর কেহই নহে! কিন্তু পুত্রের নিকট পিতার মনোভাব গোপন রহিল না; কারণ সেও পিতার মতই চাল চালিতে জানে—পিতার যোগ্য পুত্র বটে! নিজের তহবিল হইতে নগদ কিছুই স্কুলের জন্য দিবেন না বলিয়াই যে তিনি এ দলাদলির কর্ণধার হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভুবন পিতাকে বলিল, "যাতে দেশের দশজনের হিত হয়, তেমন কাজে বাধা দেয়া সুবিধে নয়। বলায়ের পিতা স্কুলের জন্য পাঁচশ টাকা দান করেছে, আরো পাঁচশ দিতে রাজি; বলাই ত নিজের খেয়ে বিনা পয়সায়ই খাটছে। এমন ত আর কেউ স্কুলের জন্য কর্‌ছে না, কর্‌বেও না। আমরা যখন কিছুই দিচ্ছিনে, তখন নীরব থাকাই ত আমাদের পক্ষে ভালো।"

কালীমোহন বাবু চক্ষু দুটী বড় করিয়া বলিলেন, "শোন্‌লাম্, তুমিও ত বলাইর মত বিনা পয়সায়ই খাট্‌তে মতলব করেছ! লেখা-পড়া শিখে বুদ্ধি-শুদ্ধি পুড়ে খেলে নাকি? এর পরে আইন পড়্‌তে হবে, জেনে রাখো। হুজুগে মেতে কোনো কাজে লেগ না—বল্‌ছি।"

ভুবন সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আপনার মত না নিয়ে আমি কোনো কাজ কর্‌তে যাবো, তা মনে কর্‌বেন না। আমি বল্‌ছি যে, আমরা স্কুলের পক্ষেই থাক্‌বো, বিপক্ষে গিয়ে সুবিধে হবে না, —ঠক্‌তে হ'বে।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখ্‌বো," বলিয়াই কালীমোহনবাবু চাদরখানা টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

বলাই প্রথম হইতেই স্কুলের জন্য খুব খাটিতেছিল। ধরিতে গেলে, সেই ছিল নীরদের দক্ষিণ হস্ত। তাহার মত খাঁটি কর্ম্মীর সাহায্য না পাইলে নীরদ স্কুলটা কখনই গড়িয়া তুলতে পারিত না। কালীমোহন বাবুর বিপক্ষতায় বলাই হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছিল অনেকখানি, তাই সে স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এদিকে তাহার পিতাও স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিল। কিন্তু ভুবন বাড়ী আসিয়াই বলাইয়ের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিল। কাজেই জটিল সমস্যায় পড়িয়া একদিন বলাই নীরদকে বলিল,—"আমায় ছ'মাসের ছুটী দিতে হ'বে, নীরদ-দা! আমার পুরাণো মতলবটা কাজে পরিণত করা যায় কি না, একবার দেখ্‌বো।"

নীরদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে আবার কি? এমন কি প্রয়োজন সহসা তোমার হ'ল যে, এককালে ছ' মাসের ছুটী নিতে হ'বে? তুমি না থাক্‌লে আমি একদিনও যে স্কুলটা চালাতে পার্‌বো না।"

বলাই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "একদিন আমি কারবার ধর্‌বার কথা বলেছিলাম, মনে পড়্‌ছে কি নীরদ-দা?—মাছের ব্যবসা ধর্‌বো বলেছিলাম। আমার সে ইচ্ছেটা সফল কর্‌তে পারি কি না, চেষ্টা কর্‌বো। আমি আর একটা কিছু করি, বাবারও সে ইচ্ছে। স্কুলের কাজে থাক্‌লে, অন্য কাজে মন দেবার আর অবসর থাকে না; তাই বিদায় নিতে হ'বে।"

"তোমার বাবা কেন ব্যবসা ধর্‌তে বলছেন, তা বোঝবার আর বাকী নেই। এতদিন আমরা দু'জনে কাজ কর্‌ছিলাম; এখন

ভুবনও কাজে নাম্‌বে, বল্‌ছে। তিন বন্ধুতে মিলে কাজ কর্‌বো, ভয়-ভাবনা কিসের ? স্কুলের গোলমালগুলো দু'দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। এখন তুমি ছুটী নিলে যে সব শুভ সঙ্কল্প পণ্ড হ'বে।"

"আমি যে জন্যে বিদায় চাচ্চি, তা ত খুলেই বল্লাম্‌। স্কুলের প্রতি আমার কখনো অযত্ন থাক্‌বে না। আমি যথাসাধ্য খাট্‌বো, কিন্তু মাষ্টারের পদে থেকে নয়।"

"তা হ'লে সে কথা আমিও ত বল্‌তে পারি ভাই ! আমাদের উভয়ের আশা-ভরসা, কল্পনা-কামনা এক বলেই ত একত্র কাজে নেমেছি।"

"না, নীরদ-দা ! তুমি কাজ ছাড়্‌লে স্কুল একদিনও চল্‌বে না,—তা হ'তে পারে না। আমি ছ'মাস পরেই ত আবার কাজে ফির্‌বো ;—ভাবনা কি ?"

"শুধু স্কুল নিয়েত আমাদের কাজ নয় ভাই ; আরো দু'দশটা কাজে হাত দিতে হ'বে। এখুনি তুমি বিদায় নিলে সব কাজ পড়ে থাক্‌বে। কিছুতেই তুমি এখন বিদায় পাবে না।"

বলাই সেদিন নিরাশ হইয়া গেলেও পরদিন আবার বিদায়ের জন্য জেদ করিতে লাগিল ; কারণ সে একটা ব্যবসায় না ধরিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। অগত্যা তাহাকে এই সর্ত্তে তিন মাসের বিদায় দেওয়া হইল যে, কোনও প্রয়োজনীয় কাজে ডাকিলেই তাহাকে হাজির হইতে হইবে এবং বিদায় অন্তে আবার কাজে যোগদান করিতে হইবে। এ তিনমাস বলাইয়ের পরিবর্ত্তে ভুবন অস্থায়ীভাবে কাজ করিবে, স্থির হইল। কালীমোহন বাবু প্রথমতঃ

এ ব্যবস্থায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন; কিন্তু ভুবনকে প্রতিমাসে ত্রিশটাকা করিয়া দেওয়া হইবে বলায় শেষে তিনি নীরব হইলেন।

৯

তবে কি ভুবন পিতার অমতেই কাজ করিতে রাজী হইয়াছিল? যাহারা ভিতরের খবর জানে না, তাহারা বলিল, পিতার অমতেই সে স্কুলের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নীরদ এবং আরও দু-তিনটী যুবক জানে যে, কালীমোহন বাবুর মতি ফিরিয়াছিল; তাই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার মতি ফিরিবার মূলে ছিল ভুবনের একটা চাল।

ব্যাপারটা এই। বলাই বিদায় লইলেই ভুবনের পরামর্শ মতে নীরদ এক সভায় কালীমোহন বাবু ও তাঁহার দলের লোকদিগকে আহ্বান করিল। সভায় উপস্থিত হইতে কালীমোহনবাবুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না; কারণ তিনি বেশ জানিতেন, তাহাতে তহবিলে হাত না পড়িয়া যায় না। তাঁহার পক্ষের লোকেরা বুঝাইল, এ সুযোগে স্কুলের কর্ত্তৃত্ব হাতে না লইলে মান-কাণ বজায় থাকিবে না। তথাপি তিনি সভায় যাইতে চাহিলেন না; কারণ তাঁহার নিকট মান-কাণের চেয়েও টাকা ঢের বড় চিজ্। তিনি ভুবনকে ও স্ব-পক্ষের অন্যান্য লোককে বুঝাইয়া বলিলেন, টাকা থাকিলেই বড় মানুষ হওয়া যায়,

মান-কাণও বজায় রাখা চলে, আর অমন দু'দশটা ইংরেজী স্কুলও খোলা যায়। যে স্কুলটা বিবাদের গোড়া, তার জন্য কপর্দ্দকও খরচ করা নেহাত অজ্ঞতা। কিন্তু যখন নীরদ গিয়া বুঝাইল, সভায় গেলে টাকা-কড়ি কিছুই দিতে হইবে না, বরং সম্মানজনক প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভ করা যাইবে এবং স্কুল-তহবিলের টাকা-পয়সার ব্যবস্থার ভারও তাঁহার হাতে থাকিবে, তখন তিনি সহজেই উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ সেদিনের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকেই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপতি করা হইল এবং জানান হইল যে, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ মত সকল কাজ সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

কালীমোহনবাবু খুব খুশী হইয়া বলিলেন, "তা দেখো, নীরদবাবু! তোমাদের মত উৎসাহী যুবকদের দিয়েই এ সব কাজ চল্‌বে ভালো। আমরা এর বুঝিইবা কি, আর খাটবার মত শক্তিই বা কৈ? তবু ডেকেছ, তাই আস্‌তে হ'ল। আচ্ছা বাপু, স্কুলের ফাণ্ড-টাণ্ড কি কিছু নেই? থাক্‌লে, তারও ত একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কেমন, সত্যি নয় কি?"

"আজ্ঞে, ফাণ্ডে খুব কমই জমে; এই ধরুন্‌, পাঁচ-সাত টাকা মাত্র; জম্‌লেই খরচ হয়ে যায়, কিছুই থাকে না। এতদিন..." নীরদকে বলিতে বাধা দিয়া কালীমোহন বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না—না, ফাণ্ডটা বড় করতেই হ'বে, তা না হলে চল্‌বে কেন? টাকা কোত্থেকে আস্‌বে, তা—তোমরা ছেলেমানুষ—অতটা বোঝ না এখনও। সে ভার আমার ওপর। আচ্ছা, ফাণ্ডটা—তাহ'লে, কার নিকট..."

"ফাণ্ডটা ত আপনার নিকটই থাক্‌বে। এতদিন সেটা আমার কাছে রেখেছিলাম, তার হিসেবটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো।"

"তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে আর কি হবে? হিসেব ত স্কুলে তোমার কাছেই থাক্‌বে। টাকাটা—তোমরা ছেলেমানুষ কিনা—কোন মাতব্বর লোকের কাছে টাকাটা গচ্ছিত রাখ্‌লে—কি বল,—তাতে ভালো হবে না?"

"আজ্ঞে, হাঁ, আমিও তাই ভালো মনে কর্‌ছি—আপনার কাছে টাকা-পয়সা থাকাই নিরাপদ।"

যদিও মেম্বারগণ জানিতেন, কালীমোহন বাবুর কাছে টাকা রাখা নিরাপদ মোটেই নয়, তথাপি সকলেই নীরব রহিলেন। একে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রটী সম্মুখে, তাহাতে ছিল নীরদের নিষেধ। তাই এদিনকার সভায় কেহ কোনরূপ আপত্তি তুলিলেন না, নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন।

সাতদিন পরেই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বৈঠক বসিল; তাহাতে কালীমোহনবাবুই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। একজন মেম্বার প্রশ্ন করিলেন, 'ঘরের জন্য হাজার টাকার প্রয়োজন; সে টাকার কি হইবে?' মেম্বারগণ সাধ্যমত চাঁদা দিবেন এবং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন, এ ব্যবস্থাই অনেকে সঙ্গত বোধ করিলেন। কালীমোহন বাবু বলিলেন, "হাঁ, মেম্বরদের চেষ্টায়ই ত হবে, চেষ্টা কর্‌লে হাজারের ঢের বেশী তহবিলে জম্‌বে। নীরদকে বল্‌ছি, তোমরা ছেলে মানুষ,—কাজটা তলিয়ে দেখ্‌বার মত পাকা বুদ্ধি এখনো তোমাদের হয়নি। রয়ে-সয়ে কর্‌তে হয়, সহ্য কর্‌বার মত

ধৈর্য্যই বা তোমাদের কৈ ? আমার বুদ্ধি ধরো,—আমি ত টাকা পয়সা নেড়ে-চেড়েই চুল পাকিয়েছি। এ-অঞ্চলে যে কয়জন মহাজন আছে,—অর্থাৎ স্কুলের হিতকামী মহাজন যারা, আমি তাদের কথাই বল্‌ছি,—তারা যদি স্কুলের সাহায্য বলে সুদের সঙ্গে প্রতি টাকার ওপর নির্দ্দিষ্ট হারে কিছু আদায় করে, তবেই ত স্কুলের অর্থাভাব ঘোচে।"

নীরদ বলিল, "বেশ ত, আপনি বিজ্ঞ লোক, আপনার কথায় কে অমত কর্‌বে ? আপনি যে সুব্যবস্থা কর্‌বেন আমি তাই মেনে নিতে রাজি আছি। যদি এরূপেই অর্থ সংগ্রহ হতে পারে, তার ব্যবস্থা করুন্। কিরূপ হার ধরে টাকা ওঠাবেন তা আপনিই বলুন ;—আপনি ত একজন মহাজন।"

কালীমোহনবাবু মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "দেখো, এর মধ্যেও আবার ভাব্‌বার একটা বিষয় রয়েছে। জানোই ত, আমার একটা বদনাম যে, আমি কড়া সুদে টাকা ধার দিই। আমার টাকা সেজন্যে সহজে আদায় হয় না ; মামলা কর্‌তে হয় বিস্তর। কালাচাঁদ এবং অন্যান্য যারা কম সুদে টাকা খাটায়, তাদের পক্ষে স্কুলের সাহায্য বলে বেশী আদায় করা খুব সহজ। সে ত এখুনি পাঁচশ দেবে বল্‌ছে ; বরং আরো পাঁচশ তার নিকট হ'তে ধার করে আনা হোক্। সে টাকাটা সে নিজেই তার খাতকদের থেকে ওঠায়ে নিতে পার্‌বে।"

একজন মুখর মেম্বার বলিল, "ছি ! ছোট জাতের লোক হ'তে আমরা—বামুন-কায়েতে ধার নেব ? ও টাকা যে অস্পৃশ্য !

ছোঁয়া-ছোঁয়ি করে জাত খোয়াবার দরকার কি? আমাদের বামুন-কায়েত মহাজনরাই টাকা দেবেন; সে পবিত্র অর্থে আমরা কাজ চালাবো—ধর্ম্ম বজায় থাক্‌বে।”

কালীমোহন বাবু দমিবার লোক নহেন, যদিও তিনি বুঝিলেন, কথাটায় তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তথাপি তাহা কাটিয়া দিবার জন্য বলিলেন, “টাকা-পয়সা অস্পৃশ্য হবে কেন?—টাকা-পয়সা ত ইংরেজের তৈরী। ধাতুময় জিনিষ কোন কালেই অস্পৃশ্য হয় না,—ম্লেচ্ছ-স্পর্শেও না। অত বাছ-বিচার কর্‌লে কি কাজ চলে?”

হরিহর হাজরা নামে কালীমোহনবাবুর দলের আর এক জনে বলিল, “জান্‌তাম ছোট বলে লোকই অস্পৃশ্য হয়; টাকা-পয়সার অস্পৃশ্যতার কথা আজ নতুন শোন্‌লাম। যে টাকা ছোটকে বড় করে, সে ত চিরকালই পতিত-পাবনী গঙ্গার মত পবিত্র।”

চন্দ্রকুমার মজুমদার নামে একজন উদারচেতা শিক্ষক-মেম্বর বলিল, “টাকা যদি গঙ্গার মতই পতিতকে উদ্ধার কর্‌তে পারে, তবে কালাচাঁদবাবুরা অনেক আগেই ত উদ্ধার পেয়েছেন। এখন আর তাঁদেরে পতিত—নীচ—অস্পৃশ্য ইত্যাদি জঘন্য ভাষায় নিন্দা করা বৃথা। বরং যারা নিন্দা করে, তাদের নীচতাই প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ বলাইবাবুর মত উচ্চমনা লোক বামুন-কায়েতের ঘরেও প্রায় জন্মায় না। কি অপমানটাই না করা হয়েছে! ছি!—আমরা আবার মানুষ!—উঁচু জাত বলে আমাদের আবার গর্ব্ব! আমাদের মত হেয়—অধম জগতে আর আছে?”

কালীমোহন বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "শোন বাবা-নীরদ, বলাইকে কাজে না রাখ্‌লে বড্ড অবিচার হবে। ছেলেটী বেশ সচ্চরিত্র—খুব বিনয়ী; বামুন-কায়েতকে দেবতার মতই দেখে, নত হয়ে প্রণাম করে! ওর বাবা হীন ব্যবসা করেছে বলে, ওকে আর 'নীচ' বলা চলে না,—ওর অনেক গুণ। ওকে কাজে রাখ্‌তেই হবে; তবেই ওর উৎসাহ থাক্‌বে, টাকাও আস্‌বে।"

নীরদ বলিল, "এ ত উত্তম যুক্তি। দশের সাহায্যে যে কাজটা গড়ে ওঠ্‌বে, একজন বাদ গেলেও যে তাতে বিষম ক্ষতি। বিশেষতঃ একজন কাজের লোক বাদ গেলে, সে অভাব আর পূর্ণ হতে চায় না। আর আমরা যদি মানুষ হয়ে কেবল মানুষকে ঘৃণা-নিন্দা কর্‌তে থাকি, আর সর্ব্বদা হিংসা-দ্বেষের পথে চলি, তবে পশু আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ রইল কৈ? বরং ওরাই আমাদের চেয়ে উন্নত। ওরা বাঁচ্‌বার জন্যে না বুঝে, অন্যকে হিংসে করে; আর আমরা কর্‌ছি জেনে-শুনে, শুধুশুধু অনর্থ ঘটাবার জন্যে—নেহাত মন্দ উদ্দেশ্যে। আপনি দূরদর্শিতার ফলে বলায়ের গুণ গ্রহণ কর্‌লেন, এতে আমরা—যুবকদের দল ধন্য হলাম্। এতে আমাদের আশা-উদ্যম বাড়্‌তে থাক্‌বে। আপনাকে আমরা শতবার ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

সে-দিনকার সভায় আরও তিনটী সাধারণ প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনের পর সভা ভঙ্গ হইল।

১০

নূতন একটা কিছু করিবে, পূর্ব্ব হইতেই বলাইয়ের এ সঙ্কল্প। তাই সে-সম্বন্ধে নীরদের সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত একদিন বৈকালে সে স্কুলের দিকে গেল। তখন নীরদ কয়েকটী ছাত্রসহ স্কুল-প্রাঙ্গনে বসিয়া মুগুর দিয়া মাটীর ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। বলাইও আর একটী মুগুর লইয়া ঐ কাজে বসিয়া গেল। তখন নীরদ বলিল, "এসেছ ভাই, ভালোই করেছ; নতুবা আমাকেই তোমার কাছে যেতে হ'ত। কাজের একটা নতুন প্ল্যান্—করেছি; সেটা তোমাকে জানাবো।"

বলাই আগ্রহে বলিল, "প্ল্যানটা কি রকম, খুলেই বলো না।"

"টাকার অভাব আর ঘোচ্‌ছে না; এখন দেখ্‌ছি, শিক্ষকদের মাইনেও ধার করে দিতে হ'বে। ছাত্র-বেতন রীতিমত আদায় হচ্চে না। অনেক ছাত্রের অভিভাবকই দীন-দরিদ্র; এ দুর্দ্দিনে আদায় হবেই বা কিরূপে? মাইনে ফ্রি হবার জন্যে রোজই পাঁচ সাতখানা করে দরখাস্ত পড়্‌ছে;—বড় জটিল সমস্যার কথা! কি যে হ'বে, আমি ত ভেবে ভেবে..."

"তাত ঠিকই নীরদ-দা, আস্‌ছে বছরে অন্ততঃ একশ ছাত্র না বাড়্‌লে স্কুল চালানো বড় মুস্কিলই হ'বে। রাজারামপুরে

নতুন স্কুল বস্‌লো ; তাতেও ওদিগ্‌কার ছাত্র টান্‌ছে। তাই আস্‌ছে বছরে ছাত্র বড় বেশী হ'বে বলে মনে হচ্চে না। যাক্, ভেবে আর কি হবে? ভগবানের কৃপায় একটা পন্থা হ'বেই। টাকার অভাবে স্কুলের কাজ আর অচল হয়ে থাক্‌বে না ; একটা ব্যবস্থা করে নেবই।"

"তা ভাই, ব্যবস্থা যা হ'বে, তা ত আমার অজানা নেই,—ঘর থেকে টাকা বার ক'রে দিয়ে ব্যবস্থা করা আর কি! এত্ দিয়েও যখন বেইমানের মন পাওয়া গেল না, তখন আর দিয়ে কাজ কি? তুমি দিলেও আর নেয়া হ'বে না। এ দায় হ'তে তোমাকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যেই আমি প্ল্যানটা করেছি।"

"তা প্ল্যান যাই হোক্ নীরদ-দা, স্কুল ভালরূপে চালাবার জন্যে টাকার যা দরকার, দেবই। আর সে রাজারামপুরের স্কুলের সাথে প্রতিযোগিতা করেই চালাতে হবে। নতুবা স্কুল আমরা টেকাতেই পার্‌বো না। আচ্ছা, প্ল্যানটা কিরূপ, শুনি না।"

"শোন তবে। স্কুলের ঘণ্টার পরেই হোক্, কি মাঝেই হোক্, আমি ছাত্রদের দেড় ঘণ্টা করে শিল্প শেখাতে চাই। ভগবানের কৃপায় আমাদের এ অঞ্চলে শিল্পের উপযোগী বাঁশ, কাঠ, পাট, শণ, বেত, তাল-নারিকেল-খেজুর পাতা ইত্যাদির অভাব নেই। শুধু মাটিদ্বারাও কত রকমের শিল্প তৈরী হ'তে পারে। ভেবে দেখ্‌লাম্, স্কুলে শিল্প-শিক্ষার বন্দোবস্ত কর্‌লে, তার আয়-দ্বারাই স্কুল চালানো যেতে পারে এবং ছাত্রদের থেকে মাইনে না নিলেও চলে। এমন কি, ছেলেদের জলপানি বাবদেও কিছু দেয়া যেতে পারে।

আমাদের এ গরীবের দেশের ছেলেদের ভাগ্যে দু'বেলা ভাত ছাড়া আর বেশী কিছু জোটে না ; তাও সকলের জন্যে নয়। অনেকেই আধপেটা খেয়ে আসে, কেহ কেহ বা না খেয়েও। তাদিগ্‌কে স্কুলে কিছু জলখাবার দিলে, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'বে, মন দিয়ে কাজও কর্‌বে। ভুঁরি ঠাণ্ডা না থাক্‌লে, মুরি ঠাণ্ডা থাক্‌তে পারে না ; আমাদের দেশের ছেলেরা পড়াশুনায় কি উন্নতি কর্‌বে ? তারপর স্কুলে লেখাপড়া শিখেও এদেশের ছেলেরা পেটের দায়ে চাকুরিজীবী হয়, সুশিক্ষার অভাবে অন্য কোন পথ ধর্‌তে পারে না। তবু, একটু শিল্প-জ্ঞান থাক্‌লে পরে 'হা অন্ন—যো অন্ন' করে ঘোরতে হবে না ; একটা কিছু করে খাবো বলে ভরসা থাক্‌বে।"

"ভাব্‌বার কথা বটে ! আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থ দেখ্‌লে আমারো বুক ফেটে কান্না বেরোয়, নীরদ-দা ! পেটে অন্ন যায় না, অপেয় জল পান কর্‌তে হয়, স্বাস্থ্য টিক্‌বেইবা কি ক'রে ? সাধে কি এ দেশটা ম্যালেরিয়ার ডিপো হয়ে আছে ? আচ্ছা, শুধু শিল্প-দ্বারাই কি জলপানি সমেত সব খরচ দেয়া যেতো পারে ?"

"হাঁ ভাই, তা পারা যায়। এই ধরো, প্রতি ছাত্র গড়ে প্রতি রোজ অবশ্য দু'আনার কাজ করে দিতে পার্‌বে। আমি কম করে দেড় আনা ধর্‌লাম। তার থেকে তিন পয়সা করে জল খাবার দিলেও তিন পয়সা করে স্কুলের আয় টিক্‌বে। তিন পয়সা করে দুশ-ছাত্র দ্বারা আয় হ'ল মাসে দুশ-আশি টাকার ওপর। তার

থেকে শিক্ষকদের বেতন দু'শ, আর শিল্প বাবদে পঞ্চাশ টাকা করে মাসে মোট আড়াইশ' টাকা খরচ দিয়েও ত্রিশ টাকার ওপর তহবিলে জম্‌বে। আমরা ত এখন মাসে দু'শ' খরচ করেই স্কুল চালাচ্ছি। ছাত্র বাড়্‌লে, আয় আরো বাড়্‌বে, আর খরচও কম্‌বে।"

"প্ল্যানটা ত মন্দ নয়, নীরদ-দা ; কাজে খাটাতে পার্‌লে নিশ্চয়ই হিত হ'বে, আর আমাদের স্কুলটা একটা আদর্শ স্কুল হ'বে।"

"বল্‌তে কি,—আমার বল-ভরসা ত তুমিই, ভাই !"

"তা আমি যথাসাধ্য খাট্‌বো, শিল্প-শিক্ষা যাতে সফল হয়, তার জন্যে খুব চেষ্টা কর্‌বো। স্কুলের আয় বাড়ুক আর না বাড়ুক, চেষ্টা করে ছাত্রদের কিছু কিছু শিল্প শেখাতে পার্‌লে একটা মহৎ কাজ হবে। তার সঙ্গে তারা যে আত্ম-নির্ভর হ'তে শিখ্‌বে, তাতে সন্দেহ মোটেই নেই। তারপর আমারো একটা প্লানের কথা জানাতে এসেছি, নীরদ-দা !"

"বেশ ত, তুমি যদি নতুন আর একটা পন্থা বের করে স্কুলের উন্নতি কর্‌তে পারো, করোনা ; আমি তোমার সহায় হবো।"

"না, নীরদ-দা, আমি স্কুলের জন্যে নতুন আর কিছু কর্‌তে চাইনে। আর ভালো কিছু হতে পারে বলেও মনে হয় না। আমি যে উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়েছি, তার কাজ কর্‌বার জন্যে একটা প্ল্যান করেছি।"

"তোমার কারবারের প্ল্যানের কথা বল্‌ছো না কি ? পাগল আর কাকে বলে ! স্কুলের জন্য খেটে আর নিজের কিছু কর্‌বার কি সময় পাবে, ভাই ?"

"তা পাবো ; স্কুলের জন্তে খাট্‌লেও আমার প্ল্যানের কাজ চল্‌তে কিছু বাধা হবে না, নীরদ-দা।"

"আচ্ছা, ভাই, সেটা কি, তবে বলনা,—শুনি।"

"আমি দেখ্‌লাম, আমাদের এ অঞ্চলে অনেক পচা আর মজা পুকুর পড়ে রয়েছে,—না রাখা যায় সেগুলোতে মাছ, না খাওয়া যায় সেগুলোর জল। আমি সেগুলোর বন্দোবস্ত নিয়ে পঙ্কোদ্ধার কর্‌বো আর সেগুলোতে মাছ রাখ্‌বো। এ কর্‌লে দুতিন বছর পরেই লাভজনক ব্যবসা চল্‌বে, পুকুরগুলোর জলও ভাল হবে ; কি বলো, নীরদ-দা ?"

"হাঁ, এটা করা যায় বটে। মাছ বিদেশে চালান দিতে হবে ; নতুবা লাভ দাঁড়াবে কম। যা হোক্, লাভ কম হলেও দেশের যথেষ্ট উপকারই হবে, লোকে সুপেয় জল পাবে। যতদূর পারি, এ কাজে আমি তোমার সহায় হবো। আমাদের দেশের আরো কয়টী যুবকের উচিত—এ কাজে নামা। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কেন্দ্র করে কাজ চালা'লে, এর সাফল্য নিশ্চয়ই কর্‌তে পার্‌বো।"

"তা হ'লে চলো না, আস্‌ছে রবিবারেই কতগুলি পুকুর দেখে আসা যাক্। বন্দোবস্তের কাজ সেরে গেলেই আমি সরে পড়্‌বো, মোহনই সব কর্‌বে। এ কাজে তার খুব উৎসাহ। ভুবন-দাকেও আমাদের প্ল্যানের কথা জানাতে হবে। আমরা তিন বন্ধু মিলে কাজে হাত দিলে, নিশ্চয়ই তা সফল হ'বে।"

নীরদ ক্ষণকাল কি ভাবিল, তারপর ম্লান মুখে বলিল, "হাঁ, তা ত নিশ্চয়ই ! ভুবনকে আমার প্লানের কথাটাও জানাবো ;

তাকে বাদ দিলে চল্‌বে কেন? তার বাবা নাকি 'ল' পড়্‌বার জন্তে তাকে খুব পীড়াপীড়ি কচ্ছেন। যাহোক্‌, তোমাকে যথাসম্ভব শীগ্‌গির সব কাজ গুছিয়ে নিতে হ'বে।"

১১

একটা নূতন প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক। তাই বহুদর্শী শিক্ষক চন্দ্রমোহন বাবুর সহিত অনেক বিষয়ে নীরদকে পরামর্শ করিতে হইত। চন্দ্রমোহন বাবু ইংরাজি না জানিলেও সে অঞ্চলে তাঁহার মত বিজ্ঞ খুব কমই ছিল। নীরদ তাহার শিক্ষকের বিদ্যাবত্তায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিত; তাই শুধু প্রয়োজনে নহে, অপ্রয়োজনেও অনেক সময় চন্দ্রমোহন বাবুর সহিত আলাপ করিতে যাইত। একদা অপরাহ্নে চন্দ্রমোহন বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া নীরদ জানিল, তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ। তাই তাঁহাকে দেখিতে সে বাড়ীর ভিতরে গেল এবং যে ঘরে পণ্ডিতমহাশয় ছিলেন, সে ঘরে গিয়া উঠিল।

আধঘণ্টা হইল চন্দ্রমোহন বাবুর জ্বর ছাড়িয়াছে। তিনি শীর্ণ দেহখানি বালিশে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া বাহিরের একটা স্ফুটনোন্মুখী সন্ধ্যামালতীর উপর কোটর-প্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নেত্রদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক

ঔদাস্যপূর্ণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, আর সম্ভবতঃ ভাবিতেছেন, 'আমার বীণার সহিত ঐ ফুলটীর বড় সামঞ্জস্য ;—উভয়েই ফুটি-ফুটি করিতেছে,—ফুটিবার আর বাকীই বা কি ? উভয়ের পরিণামই ত অনিশ্চিত—উভয়েই দীনতার ক্রোড়ে কোন মতে বাঁচিয়া রহিয়াছে !' নীরদ ঘরে পা দিতেই তাঁহার চক্ষু ফিরিল ; তিনি বলিলেন, "এসো বাবা। বীণু, ও চার-পা'টা এগিয়ে দে, মা !"

রুগ্ন পিতার সেবা করিয়া যখন বীণাপাণি দেখিয়াছিল, তিনি একটু সুস্থ হইয়াছেন, তখন সে পিতার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া একমনে খাতায় চিত্র আঁকিতেছিল। চিত্র আঁকা শেষ না হইতেই পিতার আদেশ তাহার কাণে গেল ! তাহাতে তাহার হাতের পেন্সিলটী কাঁপিল, ছবিটাও কিঞ্চিৎ বিশ্রী হইল। অমনি দুটা বড় রেখা আড়াআড়িভাবে টানিয়া সে ছবিটা আরও বিশ্রী করিয়া খাতাখানি তাড়াতাড়ি বন্ধ করিল এবং নীরদের দিকে একটি মাত্র সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার সুগৌর মুখখানি অল্প রক্তিম হইয়া উঠিল। সে অমনি উঠিয়া পিতার আদেশ পালন করিতে গেল। অন্যদিন হইলে নীরদ সকলের আগে বীণার সহিতই কথা কহিত এবং ছবিটা নষ্ট করার জন্য তাহার নিকট কৈফিয়ত চাহিত। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনের অবস্থাও আজ আর ভাল নাই ; তাই সে-আলাপ প্রিয় হইলেও, তাহা অনাবশ্যক বিষয়ের ন্যায় উপেক্ষায় পরিত্যক্ত হইল। বীণার কিন্তু কৈফিয়তের ভয় ঘুচিল না ; সে চারপাটা আনিয়া দিয়াই বেগে প্রস্থান করিল।

নীরদ পণ্ডিতমহাশয়কে বলিল, "আপনার শরীরটা ত খুব ভেঙ্গে পড়্ছে; জ্বরও রোজ রোজই হচ্ছে, ক্রমাগত সাতদিন চল্‌ছে;—ম্যালেরিয়া নয় ত?"

চন্দ্রমোহনবাবু কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "এ দেশের জ্বর, ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কি হবে, বাবা? কেবল আমি কি ভোগ্‌ছি, এ ঘরে দু'জন, ও ঘরে চার জন, সে ঘরে সাত জন,—সব বাড়ীতেই জ্বরের রোগী! রোজ-রোজই ত লোকে জ্বরে পড়্ছে!"

"এখন ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়; তাই বড্ড ভয়ের কারণ। গেল বছর এ সময় ম্যালেরিয়া-রাক্ষুসী যেভাবে লোক গ্রাস করেছে, এবারও সেরূপ কর্‌লে এ দেশ অল্পকালের মধ্যেই লোক-শূন্য হবে!"

"উপায় নাই! হতভাগ্য আমরা,—পেটে অন্ন যায় না, কোন মতে দু'মুটো খেতে পেলেও তা' সুখাদ্য নয়। সুপেয় জলেরও অভাব। জীবন-ধারণের ব্যবস্থা ত এরূপ। তাতে মনের অশান্তি দিন দিন বাড়্ছে! জিনিষ-পত্রের দাম রোজ-রোজ বেড়ে যাচ্ছে, ম্যালেরিয়ায় দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তার ওপর কন্যাদায়-সমস্যা! যাঁদের টাকা আছে, তাঁরাই সাম্‌লাতে পাচ্ছেন না; আমা-দের মতো হতভাগা গরীব ত একেবারে নিরুপায়!"

ইহা বলিয়াই চন্দ্রমোহনবাবু একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বীণু, এদিকে এসো ত মা! আমার মাথাটায় একটু বাতাস করো।"

বীণা না আসিতেই নীরদ তালের পাখাখানা বিছানা হইতে উঠাইয়া লইয়া পণ্ডিতমহাশয়ের মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল।

তিনি একটু সুস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আর সেই সুখের দিন দেখ্‌বার আশা নেই নীরদ! ছেলে-বয়সে কি দেখেছি, আর এখন কি দেখ্‌ছি! তখন দেশে শান্তির ফোয়ারা ছুটেছে, হাসির ঢেউ বয়েছে; আর এখন কেবলি বিষাদ-বেদনা,—রোগ-শোক! স্বাস্থ্য টিক্‌বে কিসে, বল না?"

পণ্ডিত মহাশয়ের অন্তরের করুণ ব্যথা নীরদের অন্তঃকণের অন্তস্তরে তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত ফুটিলেও কোনরূপ সমবেদনার কথা মুখে আনিয়া তাঁহার হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসে বাতাস দেওয়া এখন আর সে সঙ্গত বোধ করিল না; শুধু মৃদু-মন্দ-স্বরে বলিল, "হতাশ হয়ে আর কি হবে, পণ্ডিতমশাই! সাহস রেখেই চল্‌তে হবে, ধৈর্য্য ধরে কাজ কর্‌তে হ'বে; আমরা যে মানুষ, তার পরিচয় দিতে হবে। আমাদের সাধ্য যতদুর, ততদুর আমরা কর্‌বোই। তাতে পল্লীর অবস্থা যে কিছু ভালো কর্‌তে পার্‌বো না, এমন ত মনে হচ্ছে না। গাঁয়ের সব যুবক একত্রিত হয়ে কাজে নাম্‌লে, এ দেশের পল্লী-শ্রী যে আবার ফির্‌বে, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমাদের মঙ্গল-কামী আপনারা শুধু আশীর্ব্বাদ করুন্।"

"তোমরা দেশের হিত কর্‌তে যাচ্ছ, আর আমরা আশীর্ব্বাদ কর্‌বো না? তুমি আর বলাই আমাদের এ অঞ্চলের গৌরব; তোমাদের সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি! এককালে তোমাদের তিনজনের ওপরই আশা-ভরসা রেখেছিলাম অনেক; কিন্তু এখন ভুবনের ওপর আমার আর তেমন আস্থা নেই। তোমরা দুজনে চেষ্টা করে যা কিছু কর্‌তে পারো বাবা!"

"ভুবনকে দোষ দেয়া যায় না, পণ্ডিতমশাই! সে ত আর পিতার অমতে চল্‌তে পারে না। তার পিতা চান, সে কিসে বেশী রোজগার কর্‌বে; তাঁর কাছে আগে টাকা, পরে আর সব। আমাদের কাজে ভুবনের বেশ সহানুভূতি আছে; মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সে দেশের কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছে।"

"তা' দূর থেকে উৎসাহ দেখান এক কথা, আর নিজে কাজে নামা আর এক কথা! তার প্রকৃতি যে তোমাদের মতো নয়, তা আমি অনেক দিন আগেই টের পেয়েছি। সেও পিতার মতনই অর্থের দাস হবে; তার পিতার সম্মতি পেলেও দু'পয়সা লাভ কর্‌তে না পার্‌লে, সে যে গাঁয়ের কাজে নাম্‌বে, এমন ত মনে হচ্ছে না। আমি তাকে পড়াবার কালেই..."

পণ্ডিতমহাশয় আরো কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না; পাশ ফিরিয়া বীণাকে সকাতরকণ্ঠে আবার ডাকিলেন। সে কাছে আসিলে তিনি জিহ্বা নাড়িয়া পিপাসা জানাইলেন।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, পথ্য তৈরী হয়েছে, এনে দেবো?"

নীরদ একটু বিরক্তির সুরে বলিল, "আবার জিজ্ঞেস্ কর্‌ছো? পথ্য এনে দেও না। জ্বর ভোগ করে শরীর খুব দুর্ব্বল হয়েছে, পথ্য পেটে গেলেই একটু জোর পাবেন।"

একবাটি সিদ্ধ সাগু আর এক গ্লাস গরম জল আনিয়া বীণা শয্যার পার্শ্বে রাখিল। বাটির উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই নীরদ একটু রাগের ভরে বলিয়া উঠিল, "এ যে খালি সাগুই দেখ্‌ছি! দুধ থাক্‌লে এর সঙ্গে কিছুটা দিলে হ'ত না?"

বীণা ক্ষোভ-কাতর-কণ্ঠে বলিল, "দুধ দিলে ত ভালোই হ'ত ; কিন্তু দুধ যে নেই,—কোথাও পাওয়া গেল না। আর দুধ বাবা খেতেও চান না।"

চন্দ্রমোহনবাবু স্নেহ-করুণ-কণ্ঠে বলিলেন,"তুমি দুধ কোথা পাবে, মা ? দেখো নীরদ, অবোধ মেয়েটার কাণ্ড ! সে আবার কোথায় দুধ খুঁজতে গিয়েছিল ! দুধ-মাছ আর আমার মুখে রোচ্‌বে না, তাতো অনেকদিন আগেই তোকে বলেছি, মা !"

নীরদ বলিল, "আপনি রোগী, পথ্য যা, তা এখন খেতেই হ'বে ; নতুবা রোগ সার্‌বে কিসে ? আমি এখুনি কিছু দুধ পাঠিয়ে দেবো ; আমাদের বাড়ীতে দুধ আছে।"

"না নীরদ, তা করোনা। দুধ-মাছ যখন ছেড়েছি, তখন তা আর মুখে দেবো না।"

বীণা ছল-ছল চক্ষে বলিল, "মা চলে যাবার পরই বাবা মাছ-দুধ ছেড়েছেন, একদিনও আর খান নি।" বলিয়াই সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

ইত্যবসরে চন্দ্রমোহনবাবু সাগুর বাটিটি উঠাইয়া মুখে একটু সাগু দিয়াই বলিলেন, "আর একটু নুন দাও, মা।"

বীণা নুন আনিতে উঠিয়া গেল। চন্দ্রমোহনবাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "অবোধ মেয়েটাকে আর বোঝাতে পারি নে, নীরদ ! ও কেবলি আমার জন্যে ভাব্‌ছে, আর কেঁদে কেঁদে শীর্ণ হচ্ছে ! ওর জন্যে এখন আমার ভাবনা হচ্ছে যত বেশী, আমার নিজের জন্য তত নয়। হায় ! মা-হারা মেয়েটার সুখ-সৌভাগ্যের

ব্যবস্থা কিছুই হ'ল না ! যে আমায় বুকের ভেতরে পুরে রাখ্‌তে চায়, আমা দ্বারা তার কিছুই হ'ল না !"

"আপনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেবলি ভাব্‌ছেন, কি করে যে আপনার রোগ সার্‌বে, আমি ত ভেবে পাই নে। আগে আপনি সেরে ওঠুন, তারপরে ত অন্য সব। মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় আপনার মত সজ্জনের মেয়ের কোনো অশুভই হ'বে না।"

বীণা নুন আনিয়া সাগুতে মিশাইয়া দিলে চন্দ্রমোহনবাবু তাহা কোনমতে গলাধঃকরণ করিয়া একটু জল খাইলেন। বীণা বাটি ও গ্লাস লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রমোহনবাবু কথঞ্চিত সুস্থ হইয়া বেদনা-বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, "কিসে শুভ হবে, নীরদ ?—আমার মতন হতভাগ্য নিঃস্ব ব্যক্তির মেয়ের শুভ হ'তেই পারে না। হতভাগ্যের ঘরে হতভাগীই যে জন্মে ! গিন্নি তার নিজের ক'খানা গহনা ছাড়িয়ে কত কষ্টে বড় মেয়েটীকে পার করেছিলেন। এখন আর তিনি নেই, অন্য সহায়ও নেই ; কি করে আমি আর এর সুপাত্র জুটাবো ? বড় দুঃখেই আমি সংসারের খরচ কমিয়ে দিয়েছি, নীরদ !"

"আপনি উপোষ কর্‌লেই আর কিছু এর সুব্যবস্থা হবে না। আমরা সবে মিলে চেষ্টা কর্‌বো, যাতে আপনার চিন্তার ভার লঘু হয়। এটাও সংস্কারের বিষয় বটে। যাতে এ-সব সমস্যার সমাধান হয়, তার জন্যে পন্থা আবিষ্কার কর্‌তেই হ'বে। পণ-প্রথায়ও যে সমাজের অবস্থা দিন দিন গুরুতর হয়ে ওঠ্‌ছে !"

"তা করো, নীরদ! দেশের হিত কর্‌তে চাইলে, এগুলো উপেক্ষার বিষয় নয়। কেবল আমি নই, আমার মত শত শত কন্যা-দায়-গ্রস্ত হতভাগ্য সমাজে রয়েছে! তোমার চেষ্টায় তাদের অন্তরের তীব্র জ্বালার আংশিক নিবারণ হ'লেও তারা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বে! ভগবান তোমার শুভ সঙ্কল্প সফল করুন।"

১২

হেড পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস আর ইহ জগতে নাই। প্রায় দুইমাস কাল ম্যালেরিয়ার সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিরুপায় হইয়া অবশেষে বিপক্ষের করুণা ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন। নির্ম্মম বৈরীর মন তাহাতে গলে নাই, সে তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার সর্ব্বস্ব—জীবন-রত্ন আত্মসাৎ করিয়া লইল। ফলে তাঁহাকে জন্মভূমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া যাইতে হইল!

নিজের টাকায় নীরদ পণ্ডিত মহাশয়ের চিকিৎসা করাইয়াছিল এবং নিজে যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষাও করিয়াছিল। তাহার ফলে পণ্ডিতমহাশয় বাঁচেন নাই সত্য, কিন্তু নীরদ যে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল, তাহা নিজ মুখেই সময় সময় ব্যক্ত করিয়াছে। মৃত্যু-

শয্যাশায়ী প্রবীণ পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে যে সকল অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাতেই সে ভাবী জীবনকে মহৎ করিয়া গঠন করিবার উপযোগী বহু সারবান উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে বাক্‌রোধ হইলেও পণ্ডিতমহাশয়ের জ্ঞানলুপ্ত হইয়াছিল না; তিনি রোরুদ্যমানা কন্যাকে নীরদের হাতে তুলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধ দিকে দুই হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ঊর্দ্ধনেত্র হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরেই তাঁহার শিথিল করদ্বয় পুনর্ব্বার শয্যায় পতিত হইয়াছিল, নেত্রদ্বয়ও চিরতরে নিমীলিত হইয়াছিল। ইহাতে বীণা মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন তুলিয়া গগন-মণ্ডল বিদীর্ণ করিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে বিস্ময়াবিষ্টের মত স্নেহময় জনকের লোকান্তর গমন দর্শন করিতেছিল। শেষ মুহূর্ত্তে পিতা তাহার উষ্ণ হস্তখানি নীরদের করে স্পর্শ করাইবা মাত্র তাহার পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা তড়িতের স্পন্দন খেলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সে আকস্মিক শিহরণে চমকিত হইয়া নীরদ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, 'কি বীণে! তোমার জ্বর আস্‌লো নাকি!' কিন্তু এ জিজ্ঞাসা অন্তরের কোণে উঁকি মারিয়াই ত্রাসে ছুটিয়া পলাইল, দাঁড়াইবার এতটুকু ঠাঁই পাইল না। কারণ তখন তাহার একান্ত ভক্তি-ভাজন পণ্ডিতমহাশয় অকালে সংসারের সকল মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন; সে সময়ে অন্যদিকে মন দিবার মত প্রবৃত্তিকে সে আমলই দিতে পারে নাই।

মৃত্যুকালে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার স্নেহ-পুত্তলি কন্যাটীকে করে সঁপিয়া গেলেও নীরদ তখন-তখনি বীণাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল না ;—ভাবিয়া দেখিল, তাহাতে বাধা-বিঘ্ন অনেক। একে বীণা বয়স্কা—বার বছরে পা দিয়াছে ; তাহাতে তাহার মাতা সত্যবতী তীর্থ-ভ্রমণে গমন করায় বাড়ীতে মুরব্বীর অভাব। এদিকে হরিমোহন বিশ্বাস যদ্যপি পৃথগন্ন, তথাপি তাঁহার নিরাশ্রয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সহসা এভাবে একজন নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির ঘরে পাঠাইয়া দিতে নারাজ। কাজেই নীরদ তাহাকে জ্যেঠা মহাশয়ের ঘরে থাকিতেই উপদেশ দিল এবং পিতার যাহা কিছু আসবাব ও তৈজস-পত্র ঘরে আছে, উহাদের তত্ত্বাবধানের ভারও যে তাহার উপর, তাহাও বুঝাইয়া দিল। বীণা ন্যাকা বা বোকা নহে ; তাহার পিতা তাহাকে সযত্নে যাহা যাহা শিখাইয়াছিলেন, তাহাও নিষ্ফল হয় নাই। তাই ঘোর বিপদে পড়িয়াছে জানিয়াও বীণা ধৈর্য্য-হারা হইল না এবং আর্ত্ত হাহাকার-রবে অস্বাভাবিক কৃত্রিম-ক্রন্দন জুড়িয়া দিয়া বৃথা শোক-প্রকাশের চেষ্টা করিল না ; বরং আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিতেই প্রস্তুত হইল। সে এক্ষণে শুধু অঞ্চলে সিক্ত চক্ষুদ্বয় মুছিয়া নতশিরে বলিল, "বাবা আমায় আপনার করে সঁপে গেছেন। এখন আপনিই আমার মুরব্বী ; আপনি যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।"

কনিষ্ঠের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হরিমোহন বাবুকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না, পণ্ডিতমহাশয়ের যে-যে ছাত্র নীরদের পরিচিত ছিল, সে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায়

করিল; তাহাতেই শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বীণার ভরণ-পোষণের জন্যও ভাবনার কিছুই নহে; কারণ চন্দ্রমোহন বাবুর যে কয় কাঠা জমি আছে, তাহাতে সচ্ছলভাবেই এক জনের ভরণ-পোষণ হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিল, বীণার বিবাহের কি হইবে? হরিমোহন বিশ্বাসই নীরদকে এ প্রশ্ন করিলেন এবং একাজের জন্যও কনিষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছাত্রগণ হইতে চাঁদা আদায় করা যায় কি না, সে পরামর্শ চাহিলেন। নীরদ তদুত্তরে বলিল, "আবশ্যক হলে সে ব্যবস্থা কর্‌তে ভুল হ'বে না। পণ্ডিতমহাশয়ের নিরাশ্রয়া কন্যাটীর ওপর আমারো কর্ত্তব্য রয়েছে। কিন্তু এখ্‌খুনি ত তার বিয়ের জন্যে ভাবনার কিছুই নয়, এক বৎসরের মধ্যে এর আলোচনা না কর্‌লেও চলে।"

হরিমোহন বাবু বলিলেন,"তুমি এখনো ছেলে মানুষ নীরোদবাবু, সংসারের অভিজ্ঞতা,—অবশ্য বড়াই কর্‌ছিনে—আমাদের চেয়ে তোমার যে কম, তা স্বীকার করো আর না করো, বুড়ো বলেও আমাদের কথার একটা মূল্য আছে, ধরে নিতে পারো, এবং সে জন্যেই বল্‌তে চাই যে, আগের থেকে চেষ্টা-চরিত্র না কর্‌লে তোমার ঘাড়ের এ ভারী বোঝাটা নামাতে শেষে বড় বেগ পেতে হ'বে। এক বছর ত দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যাবে।"

"বোঝা আমার ওপর যত ভারী করেই চাপুক্ না কেন, সেজন্যে আমি একটুকুও চিন্তা করিনে। আপনি আর অন্য যে কয়জন বীণার আত্মীয় আছেন, সকলে সহায় থাক্‌লে, এ কাজটা আমি অতি সাধারণই মনে কর্‌ছি।"

"তা তোমার কিরূপ অর্থেরবল, তুমিই জানো বাপু! একাজে —আমি বল্‌ছি,—অর্থ লাগবে বিস্তর; তাতে বীণার কোনো আত্মীয়ই কিছু দেবে না, আমারো দেবার মতন শক্তি-সামর্থ্য নেই, জানো ত। ভেবে দেখো নীরোদবাবু,..."

বীণার সমক্ষে এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অসঙ্গত বোধ করিয়া নীরদ শুধু 'আচ্ছা' বলিয়াই উঠিল এবং এ-দিনকার মত বিদায় হইল। যাইবার কালে সে বীণাকে বলিল, "দেখো বীণে, এখন তুমি বয়সে ছোট্ট নও, পড়া-শুনাও কিছু করেছ। নিজেই এখন বুজে-শুনে চল্‌বে, আর প্রয়োজন হলে আমাকে খবর দেবে। আমাকে আপনার জন বলেই জান্‌বে। হতাশ হয়ো না; সত্যের পথে চল্‌লে পরিণামে অশুভ হয় না।" বীণা এ উপদেশকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া মনের দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিল।

মাস দুই পরে নীরদ আহারে বসিয়া কনিষ্ঠা ভগ্নী মাধবীর কাছে শুনিল, রান্না করিবার কালে তাহার মাতার একটী অঙ্গুলী পুড়িয়া গিয়াছে, তিনি বিছানায় পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। নীরদের মুখে আর ভাত উঠিল না, সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া গিয়া মাকে শান্ত করিবার জন্য আবেগ-পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি এতদিনে কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে পেরেছি; আমি বিয়ে কর্‌বো।"

সত্যবতী অমনি উৎসাহে উঠিয়া বসিলেন,—যেন তাঁহার আঙ্গুলের জ্বালা-যন্ত্রণা তখন-তখনি লুপ্ত হইয়া গেল! তিনি স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন, "তোর যদি তেমন সুমতিই হয়ে থাকে,

তবে ত আমি হাতে স্বর্গ পাচ্ছি। এভাবে যে সংসারটা আর চলে না, তাত তুই স্বচক্ষেই দেখ্‌ছিস্। আমার শরীরটা ত দিন-দিনই ভেঙ্গে পড়্‌ছে; বৌ-মার হাতে সংসারটা তুলে দিয়ে যেতে পার্‌লে যা হোক্, একটু শান্তি পেতাম্।"

নীরদ লজ্জা-জড়িতকণ্ঠে বলিল, "হাঁ মা, তুমি বিয়ের চেষ্টা করো; আমি আর তাতে অরাজী হবো না। তবে আমার একটা কথা তোমায় রাখ্‌তে হ'বে। আমি যেমন গরীব, তেমন গরীবের কিম্বা প্রয়োজন হলে, আরো গরীবের মেয়েকেই ঘরে আন্‌বো; নবীন চাটুয্যে কি প্রভাস চৌধুরীর মেয়েকে আন্‌বো না। কুল কি অর্থের দিকে আমি চাইবো না, একটী গরীব পরিবারের হিত যাতে হয়, তাই দেখ্‌বো।"

সত্যবতী একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে বলে বলে আমার মুখটা ঝালা-পালা হয়ে গেছে; তাই আমি আর কিছুই বল্‌বো না। তুই যাকে এনে সংসার-ধর্ম্ম করে সুখী হোস্, তাকেই আন্‌বি, আমি বাধা দিতে যাবো কেন? আমি আর ক'দিন আছি? এখনো যে সংসারি কর্‌ছি, তা সাধ করে নয়; তোর সংসারটা চলেনা বলেই কর্‌তে হচ্ছে।"

নীরদ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মা, তুমি সয়ে যাচ্ছ বলেই আমি তোমার মনে নিয়ত কষ্ট দিচ্ছি। আমি তোমার অযোগ্য কু-সন্তান; কিন্তু তুমি আমার দয়াবতী স্নেহময়ী জননী। তোমার স্নেহ-মমতায় আমি দিন দিন পরিপুষ্ট হচ্ছি, আর তুমি আমার জন্যই খেটে খেটে শুকিয়ে শীর্ণ হচ্ছ! সুতরাং তোমার মত সহিষ্ণু

আর নেই, আমার মত ভাগ্যবানও নেই। পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যফলেই তোমার গর্ভে জন্মেছি, মা। কিন্তু আমার মত দুশ্চরিত্র আর অকৃতজ্ঞ এ জগতে দ্বিতীয়টী মিলে না।"

মাধবী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে স্মিত-মুখে বলিল, "ও পাড়ার মাসী-মা বল্লেন, পুবেরগাঁয়ের পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে বীণাকে নাকি বৌ-দি করা হবে বলে মত দিয়েছ, দাদা!—সত্যি না কি?"

নীরদের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল কিন্তু তাও ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সে বিস্ময়-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "কৈ!—ওসব মিথ্যে কথা! মৃত্যুকালে পণ্ডিতমশাই তাঁর কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন বলেই তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে কেন?"

মাধবী পূর্ব্ববৎ সহাস্য বদনে বলিল, "মাসী-মা আরো বল্লেন, তুমি পাছে বীণাকে বে' করো, সে ভয়ে তার জ্যেঠা-মশাই নাকি তাড়াতাড়ি করে তার বে' দেবেন। বরও ঠিক করা হয়েছে; —ভরতপুরের চন্দরনাথ চক্কোবত্তির ছেলে সতীশ। তারা বড় লোক, অনেক টাকা দেবে বলেই হরিমোহনবাবু এ সম্বন্ধে রাজী হয়েছেন।"

নীরদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তা তার মুরব্বী হ'ল জ্যেঠা; তিনি যা ভালো মনে করেন, তাই ত হ'বে। তবে একটী ভাল ছেলের হাতে ওকে দিলেই মানা'ত।"

"কিন্তু বীণার এ বে'তে অমত। সে নাকি সর্ব্বদা তার পিতার জন্যে কাঁদ্‌ছে, আর বসে বসে ভাব্‌ছে। বে'র কথা শোন্‌লেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে' ওঠে চলে যাচ্ছে।"

নীরদের বক্ষ হইতে একটী রুদ্ধ নিশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া গেল। বীণার মনের অসহ্য যাতনা সে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়া আকুল হইয়া পড়িল এবং প্রতিকারের কি উপায় আছে, ভাবিতে লাগিল। কিন্তু উপায়ের কোনও সূত্রই সে খুঁজিয়া পাইল না, ভাবনার ভারও কমিল না; সুতরাং অন্যমনে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মাধবী তাহার মাতাকে বলিল, "শুনেছি, সতীশ নাকি বড় বদ্ ছেলে,—পড়া-শুনা কিছুই করেনি, চরিত্রটাও নেহাত মন্দ। ওর হাতে বীণাকে দিলে বড় নিষ্ঠুরতার কাজ হবে, মা! বীণা যেমন গুণবতী, তেমনি বুদ্ধিমতী। সম্ভবতঃ সে তার ভবিষ্যত চিন্তা করেই এ বে'তে মত দিচ্ছে না। নয় কি, মা?"

সত্যবতী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। এক্ষণে মাধবীর কথা শেষ হইলে সহানুভূতির সুরে তিনি বলিলেন, "তাই হ'বে। মেয়েটীর নাকি বিদ্যা-বুদ্ধি, গুণ-জ্ঞান অনেক। সতীশ যে মন্দ ছেলে, তা এ অঞ্চলের সকলেই ত জানে।"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "ওকে দাদার জন্যে আন্‌লে হয় না, মা? দাদা ত গরীবের মেয়ে বে' করতে রাজী আছেন। আর মর্‌বার-কালে পণ্ডিতমশাই বীণাকে দাদার হাতেই ত সঁপে দিয়েছিলেন।"

সত্যবতী বিষম বিরক্তির সুরে বলিলেন, "আমি বে'র কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না, মা! ওর যাকে ইচ্ছে হয়, তাকে বে' করুক্‌গে,—আমি হাঁ-না কিছুই বল্‌বো না। বরং তোর মতটা—তুই গিয়ে তাকে জানা গে।"

১৩

পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর এগার মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আগের দুইমাসে নীরদ যেরূপ আগ্রহের সহিত বীণার তত্ত্ব-তালাস করিয়াছিল, শেষের নয় মাসে তেমন করে নাই। কারণ হরিমোহন বিশ্বাস তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। প্রকাশ্যে তিনি কিছু না বলিলেও তাহার ব্যবহারে নীরদ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল ; তাই সাবধান হইয়াছিল। এদিকে বীণার জ্যেঠামহাশয়ের মুরব্বিয়ানায় অনেক কথা মাধবী মাঝে মাঝে তাহাকে জানাইত। তাহাতে সে আরও সাবধান হইয়াছিল এবং প্রয়োজনেও সেদিকে পা দিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল। নয়মাসের মধ্যে মাত্র তিনদিন সে বিশ্বাস-বাড়ীতে গিয়াছিল ; একদিন গিয়াছিল—বীণাকে আটটি টাকা ধার দিতে, আর দুইদিন গিয়াছিল—বীণাকে দেখিতে। পিতার মৃত্যু-তিথির শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবার জন্য হরিমোহন বিশ্বাস তাঁহার কনিষ্ঠের অংশের আট টাকা বীণার নিকট চাহিলে বীণা নিরুপায় হইয়া নীরদকে সে সংবাদ জানাইয়াছিল এবং সে স্বয়ং গিয়া বীণাকে টাকা দিয়াছিল। তারপর বীণা রোগে পড়িলে সে সংবাদও নীরদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। তাই নীরদ দুইদিন গিয়া বীণাকে দেখিয়াছিল এবং বেদানা, কিসমিস আর আঙ্গুর

কিনিয়া দিয়াছিল। তারপর নীরদ একদিন এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া বীণাকে জানাইল, "তোমাকে কিছু দেওয়া তোমার জ্যেঠা-মহাশয়ের অনভিপ্রায়, বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার এ মন্দ ইচ্ছাকে আমি ঘৃণার চক্ষেই দেখিব এবং তাঁহার ইচ্ছামত তোমার সহিত আর দেখা করিতে যাইব না। তথাপি তুমি আমাকে চির-হিতৈষী বলিয়াই জানিবে। আবশ্যক হইলে তোমার হিত-কল্পে আমার সর্ব্বশক্তি, এমন কি, ক্ষুদ্র জীবন পর্য্যন্ত দান করা হইবে।"

বীণাকে যাহা জানান হইল, সে তাহা জানিল না ; কারণ জ্যেষ্ঠ-তাত মহাশয়ের চতুরতায় পত্র-খণ্ড মধ্যপথে অন্তর্হিত হইল। জ্যেঠা মহাশয় আর একটা চালও চালাইলেন,—বীণার নামে নীরদের নিকট লিখিলেন, "আপনার মত হিতৈষী মুরব্বী আমার আর কেহ নাই ; তাই আসন্ন বিপদে আপনার শরণ লইতে হইল। স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয়ের সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধের আর মাত্র কয়েক দিন বাকী। কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিব, ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছি। পুরোহিত মহাশয় বলিয়াছেন, এক শত টাকার কমে কাজ চালান যাইবে না ; কিন্তু মাত্র ত্রিশটী টাকা জ্যেঠা মহাশয়ের হাতে আছে। আপনাদের সাধারণ-তহবিল হইতে কিছু সাহায্য পাইলে নিতান্ত উপকৃত হইব। তাহা পাওয়া না গেলে আপনি আমাকে সত্তরটী টাকা অবশ্য ধার দিবেন। আপনি আসিতে বাধা থাকিলে আপনার ভ্রাতা-দ্বারাই প্রার্থিত টাকা পাঠাইবেন। না পাঠাইলে আমার পিতার শেষ কার্য্যটুকু কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না এবং এ দুঃখ এ জীবনে আর ঘুচিবে না।"

পণ্ডিত মহাশয়ের নিরাশ্রয়া কন্যাটীকে সুখী করিবার জন্য জীবন দান করাও নীরদের কাছে বেশী কিছু নয়, টাকা ত তুচ্ছ! সে নিজের তহবিল হইতে মাত্র বিশ টাকা বাহির করিতে পারিল, বাকী পঞ্চাশ টাকা বলাইয়ের তহবিল হইতে লইয়া দিতে হইল। বীণার লিখনানুসারেই সে অনিলের মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিল, নিজে গেল না।

হরিমোহন বিশ্বাস টাকাগুলি হস্তগত করিয়া অনিলকে বিদায় করিয়া দিলেন, পরে বীণাকে সে সংবাদ জানাইলেন। বীণা সংবাদ জানিয়া আনন্দিত হইল না, বরং দুঃখিত হইল এবং এরূপ ষড়যন্ত্রের মধ্যেই তাহাকে দিনপাত করিতে হইবে ভাবিয়া ভাবী দুঃখ-দুর্দ্দশার আশঙ্কায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তথাপি সে ধৈর্য্য হারাইল না; কেবল বলিল, "শ্রাদ্ধের কাজেই সব টাকাগুলো খরচ কর্‌বেন; এর একটি কানা-কড়িও আর কোনো কাজে খরচ করা উচিত নয়।"

হরিমোহন বিশ্বাস কোন দিনই উচিত-অনুচিত বিচার করিয়া কাজ করিতেন না। তিনি অতি সঙ্ক্ষিপ্তভাবে কাজ সম্পন্ন করিলেন; তাহাতে খরচ হইল মাত্র উনত্রিশ টাকা পাঁচ আনা! বীণা সমস্তই জানিতে পারিল, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিল না! কিছু না বলিবার একটা কারণও ছিল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবস সে নীরদ ও আর দুই জন পরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিলে হরিমোহন বিশ্বাস তাহাকে অযথা কতগুলি কটূক্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে বীণা মরমে মরিয়া গিয়াছিল এবং বেশ

৬

বুঝিয়াছিল, টাকা পয়সার কথা কিছু বলা বিড়ম্বনা মাত্র। জ্যেঠা মহাশয়ের সকল উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিবার জন্যই সে সেই হইতে মনকে দৃঢ় করিয়াছিল।

কনিষ্ঠের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াই হরিমোহন বিশ্বাস ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের ষড়যন্ত্রটা পাকাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন এবং নিজে দুইশত টাকা হস্তগত করিয়া বীণাকে সতীশের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কনিষ্ঠের স্নেহের প্রতিমা কূপোদকে পতিত হইবে বলিয়া তাহার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই; তিনি চান টাকা, টাকা পাইলে সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্মেই যে লিপ্ত হইতে পারেন! একদিন অতি প্রত্যূষে তিনি ভরতপুরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহের কথা পাকা করিলেন। পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম হাতে লইয়া স্থির করিয়া আসিলেন, চৈত্র মাসের বাকী কয়টা দিন গেলেই বৈশাখের যে দিবস সর্ব্ব প্রথম বিবাহের তারিখ পাইবেন, সে দিনই বীণাকে বধ করিবেন। হায়! টাকার লোভে লোকে কি না করিতে পারে! স্বার্থে অন্ধ হইয়া লোকে আপনার জনের সর্ব্বনাশ-সাধনেও পশ্চাৎ-পদ হয় না!

জ্যেঠা মহাশয় পরদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে বীণাকে কাছে বসাইয়া আদরের ভাণ করিয়া বলিলেন, "মা, আমিই এখন তোমার একমাত্র মুরব্বী; যাতে তোমার হিত হয়, তাই প্রতিক্ষণ দেখ্‌ছি। চন্দ্রমোহন তোমায় ফেলে অকালে চলে গেল; কি কষ্টে আমি তোমায় একটী বছর..."

হরিমোহন বিশ্বাসের বাক্য শেষ হইল না ; ঝর্-ঝর্ করিয়া বক্ষের উপর চক্ষের জল পড়িতে লাগিল,—যেন তাহাতেই তাঁহাকে আকুল করিয়া বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল ! তিনি অবশেষে গামোছায় চক্ষু মুছিলেন ; তাহা দেখিয়া বীণার সরল হৃদয় সত্য সত্যই উচ্ছ্বসিত হইল। সে বেদনা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমি পোড়ারমুখী—হতভাগী, আপনাদের কষ্ট দেবার জন্যেই জন্মেছি! সাতের বছরে মাকে খেলাম, পিসী-মাকে খেলাম দশ বছরের মধ্যে, তারপরে এই বারোয় পা দিয়েই খেলাম বাবাকে! আমার মতো রাক্ষুসী আর কে আছে ? এখন আপনাদেরও কত জ্বালাতন কচ্ছি !"—টস্ টস্ করিয়া বীণার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল !

হরিমোহন বিশ্বাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "না, মা ! সে দারুণ শোকের কথা আর তুলোনা, মা ! নিয়তিকে যে কেউ লজ্ঘন কর্তে পারে না। তাই সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নেই মা ! আমিও সইছি, তুমিও সহ্য করো। তারপর তুমি ত নিজের খাচ্ছ, নিজের পর্ছ মা, আমায় জ্বালাতন কর্ছ আর কিসে ? তবে তোমার বে'র বয়েস হয়েছে, মুরব্বী বলে এই যা আমার ভাবনা। তা তারও পথ করেছি। ভরতপুরের চন্দ্রনাথ চক্কোত্তির ছেলে সতীশবাবু বেশ ভাল বর,—রূপে গুণে যেন কার্ত্তিক !—ঐশ্বর্য্যে ত ইন্দ্র-তুল্য !—চৈত্রের বাকী কটা দিন গেলেই তুমি সে ঘর আরো উজ্জ্বল কর্বে ;—দেখে চোখ সার্থক কর্বো !"

বিবাহের কথায় বীণা প্রথমতঃ মস্তক নত করিয়াছিল ; কিন্তু যেই শুনিল, মূর্খ ও দুশ্চরিত্র সতীশের করে তাহাকে অর্পণ করা হইবে,

অমনি তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! সে বিস্ময়াবিষ্টের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া জ্যেঠা মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল! আপনার অবস্থাটা কিরূপ গুরুতর হইতে চলিয়াছে, কতক্ষণ পরে সে তাহা বুঝিতে পারিয়া চমকিয়া উঠিল! অর্থ-লোলুপ হরিমোহনের কঠোর হৃদয়ে বীণার অন্তরের ব্যথা ছোট্ট একটা আঘাত দিল বটে, কিন্তু নিমিষেই তাহার দাগ মুছিয়া গেল! তখন তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "চন্দ্রনাথ বাবু খুব টাকাতে লোক; তাঁকে সে অঞ্চলের রাজা বল্লেও চলে। সতীশবাবু ত যেন ঠিক একটী রাজ-পুত্তুর! তার হাতে পড়া বড্ড সৌভাগ্যের কথা, মা! তোমার ভাবী সুখ-সম্পদের জন্যেই আমি এ সম্বন্ধটায় হাত দিয়েছি।"

বীণা দেখিল লজ্জার সময় নয়, নিজের কথা নিজে না বলিলে পক্ষে দু'কথা বলিবার যে আর কেহই নাই। স্বরটা সহজ করিয়া লইয়া সে বিনয়ে বলিল, "চন্দরনাথ বাবুর টাকা আছে, জানি; আর সতীশের রূপ আছে, তাও মান্‌লাম্; কিন্তু টাকা আর রূপ কি মানুষের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়, জ্যাঠা-মশাই?"

"হাঁ, দেয় মা! তাতেই যোগ্যতা বোঝা যায়। আর বরাতটাও ভালো হওয়া চাই। বরাতে সুখ থাক্‌লে তাতেই হয় মা! মনে খুঁৎ রাখ্‌তে নেই,—দিল খোলাসা রাখা চাই। এই ত শাস্ত্রে রয়েছে,—'সন্তোষমূলংহি সুখম্।" শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যে হয়, মা?"

"মনে সন্তোষ আন্‌বার মতো অবস্থা ত চাই, জ্যাঠা-মশাই?"

"সে-অবস্থাটা যে গড়ে নিতে হয়, মা! ধন-জন, রূপ-লাবণ্যই মনে সন্তোষ এনে থাকে। ক্রমে-ক্রমে সব বোঝ্‌বে, মা!"

"যার গড়্‌বার মতো যোগ্যতা নেই, তাকে ত চিরজীবনই নিরাশার আঘাতে জর্জ্জরিত হতে হয়, জ্যাঠা-মশাই! তার ভাগ্যে আর..."

বীণাকে বলিতে থামাইয়া দিবার জন্য হরিমোহন বিশ্বাস রুষ্টস্বরে বলিলেন, "বইয় দুপাতা ওল্টায়ে এখুনি ভাল-মন্দর কি জানিস্‌ তুই? বেয়াড়া হোস্‌নে,—বল্‌ছি; মুরব্বীর কথা সকল মেয়েই রাখে, তোকেও রাখ্‌তে হ'বে।"

বীণা এক্ষণে নিজের অবস্থাটা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল এবং জ্যোঠা মহাশয়ের সঙ্গে কথা কাটা-কাটিতে কোনও ফল হইবে না, তাহাও দেখিল। মুহূর্ত্তে তাহার পিতা ও পিসী-মার ছবি মনে পড়িয়া তাহাকে বড় আকুল করিল। মাতার কথাও মনে করিতে চাহিল, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে কিছুই স্মরণ হইল না, পক্ষান্তরে চক্ষে একরাশ জল আনিয়া দিল। এবার আত্ম-সম্বরণ করা তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন হইল, সে অঞ্চলে চক্ষু-দ্বয় ঢাকিয়া উঠিয়া গেল।

সে রাত্রিতে বীণা অসুখ হইয়াছে বলিয়া কিছুই খায় নাই, বিছানায় গিয়াও ঘুমায় নাই; কিরূপে ব্যাধের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিবে, সে-কথাই বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিয়াছে। অনেককাল যাবত নীরদের সহিত দেখা নাই; সে ইচ্ছা করিয়াই সেদিকে আর পা দেয় না! তাহাকে অবস্থাটা খুলিয়া বলিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে নিষ্ঠুরের মতন নীরব থাকিত না, একটা কিছু ব্যবস্থা করিতই।

কিন্তু সেপথও যে জ্যেঠা মহাশয়ের কৃপায় বন্ধ ! আর যে সদুপদেশ-দাতা কেহই নাই ;—এখন কর্ত্তব্য কি ? এরূপ নানা কথা ভাবিয়া ভাবিয়া যখন বীণা বালিশে মাথা দিয়াছে, তখন রাত্রি তিনটা। বাকী রাত্রিটা তন্দ্রা ও স্বপ্নে কাটাইয়া দিয়া সকালে যখন বীণা দ্বার খুলিল, তখন সূর্য্যের আলোতে আঙ্গিনার অনেকখানি ছাইয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী রশ্মি গবাক্ষের রন্ধ্র-পথে ঘরের মেজের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ! বীণা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া ঘাটে যাইতেছিল। কয়েক পা অগ্রসর হইলেই হরিমোহন বিশ্বাস ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীণু-মা, আজ এত দেরী করে ওঠ্‌লে যে ?—অসুখ বাড়ে নি ত ? সে দিন রোগে পড়ে আমাদের সকলকে কাঁদিয়েছ ; আবার কাঁদাবে না ত ?"

ভণ্ড জ্যেঠামহাশয়ের কপট আহ্বানে কাণ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া বীণা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। হরিমোহন বিশ্বাস হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন !

১৪

বীণা রোগে পড়িলে হরিমোহন বিশ্বাস কাঁদেন নি সত্য, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী হরিপ্রিয়ার হৃদয় সত্য-সত্যই কাঁদিয়াছিল। জ্যেঠাই-মার যত্নেই সে সে-যাত্রা কঠিন আমাশয় রোগের হস্ত হইতে সহজে মুক্তি পাইয়াছিল। হরিপ্রিয়াকে লোকে কুঁড়ে, কুটিলে, ঝগরাটে, খিট্‌খিটে ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করিলেও তাঁহার হৃদয়টা যে অপেক্ষাকৃত কোমল ও দয়ার্দ্র ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি মা-বাপ-মরা মেয়েটার উপর স্নেহ-করুণার দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন বলিয়াই সে একটা বৎসর নিরাপদে কাটাইয়াছে। নতুবা নানা দুর্দ্দশা ও দুশ্চিন্তার চাপে পিষ্ট হইয়া সে এই সুদীর্ঘ কাল জীবন বহন করিতে পারিত কি না, সন্দেহ।

বীণার প্রতি হরিপ্রিয়ার মনের টান বাড়িবার আর একটা কারণ স্বার্থের দিক দিয়াও প্রবল ছিল। জ্যেঠামহাশয়ের ঘরে গিয়া বীণা এই এক বৎসর বসিয়া খায় নাই, খাটিয়া খাইয়াছে ; তাই জ্যেঠাই-মার মনও পাইয়াছে। বীণার সাহায্যে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায়ই হরিপ্রিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার স্বামীকে শাসাইয়া বলিতেন, "বীণু ত এখনো ছোট্ট, ওর বে'র জন্যে এত তাড়াতাড়ি কচ্ছ কেন ?"

চৈত্রমাস শেষ হইতে মাত্র তিন দিন বাকী। হরিপ্রিয়া রাত্রিতে রান্না করিতে গিয়া তুই-তিনবার বীণাকে ডাকিলেন, কিন্তু তাহার সাড়া পাইলেন না। একটী বৎসর শীল-নোড়ায় হাত না দেওয়ায় ঐগুলি নাড়া-চাড়া করিয়া মসল্লা পেষণ করা তিনি বড়ই বিরক্তিকর মনে করিলেন, এ দিকে মসল্লার অভাবে ব্যঞ্জনও চাপান চলে না। তাই তিনি বীণার খোঁজে বাহির হইলেন। বীণা ততক্ষণে পিতার ঘরের জিনিষ-পত্রগুলি সিন্দুকে পূরিয়া তালা-বন্ধ করিয়া একটা পেন্সিল দ্বারা এক খণ্ড কাগজে ঐগুলির ফর্দ্দ লিখিতেছিল। হঠাৎ সে শুনিল, দ্বার হইতে জ্যেঠাই-মা ডাকিতে· ছেন, "ঘরে আছিস্ কি বীণু?—আজ রান্না-বান্না হ'বে না?"

বীণা চমকিত হইয়া উঠিল, বলিল, "যাচ্ছি;—রাত্তির কি অধিক হ'য়েছে, জেঠাই-মা?"

হরিমোহন বিশ্বাস পার্শ্বের ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো,—আর মায়া বাড়ায়ে কাজ নেই;—পোষা পাখী খাঁচা ভেঙ্গে পালাতে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে না!"

হরিপ্রিয়া ফিরিয়া রান্না-ঘরের দিকে যাইতেছিলেন; স্বামীর কথার ভঙ্গিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "পালালে তোমার তাড়নায়ই তো পালাবে; তুমিই তো ওকে পাগল করে তুলেছ! ওর বের বয়েস হ'তে ঢের দেরী, তবু দিবে-রাত্তির চব্বিশটী ঘণ্টাই খালি বে'—বে' কর্‌ছো!"

সে-রাত্রিতে শুইবার ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল; যুদ্ধ অবশ্য হইল বাক্যে, অস্ত্রে নহে। হরিপ্রিয়া তর্জ্জন-

গর্জ্জন করিয়া স্বামীকে বুঝাইতে চাহিলেন, এখনই বীণার বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তাহাতে সংসার চলিবে না। হরিমোহন ঠিক সেইরূপেই স্ত্রীকে বুঝাইতে চাহিলেন, এখনই বীণার বিবাহ দেওয়া উচিত, নতুবা সংসার চলিবে না। এই সংসার চালান ব্যাপারটাকে দুই জনে দুই ভাবে দেখিলেন। দুই জনেই প্রকৃতপক্ষে সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন ;—একজন ঘরে থাকিয়া গৃহস্থালীর ব্যবস্থায়, অন্যজন বাহির হইতে টাকা-পয়সার সংগ্রহে। দুইজনের উদ্দেশ্য এক হইলেও কার্য্য ভিন্ন, সন্দেহ নাই। তাই উভয়ে নিজ নিজ প্রয়োজনদ্বারাই বীণার বিবাহের উচিত-অনুচিতের বিচার করিলেন। শেষ মীমাংসা কিছুই হইল না। হরিপ্রিয়া বিছানায় যাইবার আগে মনের দুঃখে বলিয়া গেলেন, "তুমি ওকে যেরূপ চঞ্চল করে তুলেছ, ওকে নিশ্চয়ই হারাবে ;—হয় ও আত্মহত্যা কর্‌বে, না হয় ছুটে পালাবে। ওর মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী আছে, এক খানে গিয়ে ওঠ্‌তে পার্‌বেই। ফলে আমাকেই খাটুনি খেটে মর্‌তে হ'বে।"

হরিমোহন বিশ্বাস গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "যে-মেয়ে পিতা-মাতার, জ্যেঠা-খুড়োর কথা ধর্‌বে না, তার মরণই যে ভালো ; বাড়ী ছেড়ে গেলে, যাক্‌—মরুক্‌ গে !"

ভোরে হরিপ্রিয়া ঘরের দরজা খুলিয়াই দেখিলেন, দেবরের ঘরের দরজার গায়ে তালা ঝুলিতেছে। অমনি তিনি চেঁচাইয়া স্বামীকে বলিলেন, "ওগো শুন্‌চো ?—ঘুম ভেঙ্গেছে ? ওঠনা একবার তাড়াতাড়ি করে। ও ঘরে তালা বন্ধ কে কর্‌লে ?—বীণাই বা কোথায় গেল !"

হরিমোহন বিশ্বাস চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বাহিরে গিয়া বলিলেন, "আমি ত কালই বলেছি, পোষা পাখীর খাঁচা ভাঙ্গাটা শক্ত কিছুই নয়! নীরদের পত্রটা লুকায়েও কোনো ফল হলো না। তবে কি মেয়েটা আর কারুকে দিয়ে খবর পাঠালে? রাত্তিরে গেলইবা কি করে?"

হরিপ্রিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তারপর নিজে নিজে বলিলেন, "চৈত্রি মাসেই মেয়েটা বাড়ীর বের হ'ল;—আক্কেলটা দেখো একবার!"

হরিমোহন বিশ্বাস বলিলেন, "চুপ! ওকথা আর তুলে কাজ নেই। অন্যে শুন্‌লে কলঙ্ক রট্‌বে তো আমাদেরি। আমি এখ্‌খুনি অনু-সন্ধানে যাচ্ছি।"

বীণা স্থির করিয়াছিল, চৈত্রমাসের বাকী দুইদিন বাড়ীতে কোন মতে কাটাইয়া বৈশাখের ২রা তারিখ মামার বাড়ীতে যাইবে এবং এ সংবাদ শুধু নীরদকে জানাইবে, আর কাহাকেও না। সে কিছুতেই একাজে জ্যেঠা মহাশয়ের সাহায্য লইবেনা স্থির করিয়া পাথেয় স্বরূপ পঁচিশ টাকা চাহিয়া নীরদের নিকট চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু হরিমোহন বিশ্বাস সে চিঠি পথে হস্তগত করিয়াছিলেন। বীণা তাহা টের পাইয়া প্রতিবেশী গোপীনাথকে ধরিয়াছিল এবং গোপনে তাহাকে লইয়া সে রাত্রিতেই নীরদদের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। গোপীনাথকে সে শৈশব হইতে জ্যেঠা বলিয়া ডাকিত; সেও বীণাকে অকৃত্রিম স্নেহ-যত্ন করিত। এইরূপে এক জ্যেঠার সরল সাহায্যে সে অন্য জ্যেঠার কঠোর পীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ

করিল। রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে কথার সম্বন্ধই অনেক সময় খাঁটি হইতে দেখা যায়। রক্তের সহিত স্বার্থ মিশ্রিত থাকে, কিন্তু কথার জোরে প্রণয়ের বান ডাকে!

বহুদিন পরে বীণাকে সাক্ষাতে পাইলে নীরদের সন্তপ্ত হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা-রাশি নিমিষে লুপ্ত হইয়া তাহাকে যতখানি আরাম-দান করিয়াছিল, তাহার মাতার অবজ্ঞা আর অসন্তোষ তাহাকে ততোধিক ব্যথিত ও ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যবতী তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, বীণার আচরণ যতই সরল আর সহজ হউক না কেন, দশের চক্ষে সে নিতান্ত বদ্ ও হেয় বলিয়াই বিবেচিত হইবে এবং সেজন্য আশ্রয়-দাতাকেও তাহার সঙ্গে অংশতঃ ফলভোগী হইতে হইবে। নীরদ মনে মনে বলিল,—'আমি অন্যকে উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু মাকে কদাচ করিতে পারি না; তাই মার ইচ্ছা মতনই কাজ হইবে,—বীণাকে অন্যত্র আশ্রয় লইতে হইবে।'

যখন নীরদ বীণাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিল, তখন বীণা যাহা বুঝিতে চাহিয়াছিল, তাহা ত ভুলিলই, অধিকন্তু নিজের চেষ্টায় কিছু বুঝিবার ধৈর্য্যও হারাইল! সে মাথায় হাতদিয়া বসিয়া রহিল,—মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল! সে নীরদের গৃহে থাকিতে আসে নাই বটে, কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে যদি আসিয়াই পড়িয়াছে, তবে আবার বিতাড়িতই বা হইতেছে কেন? সে যেমন স্বেচ্ছায় আসিয়াছে, সেরূপ স্বেচ্ছায় গেলেই ত শোভন হইত; যাইবার কালে না হয় আশ্রয়-দাতাকে সরল প্রাণে মনের কথা বলিয়া যাইত। আর মনের কথা খুলিয়া বলিবারই বা কি আছে; তাহার

সর্ব্বজ্ঞ আশ্রয়-দাতাইত হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত সুতীক্ষ্ণ নজরে নিরীক্ষণ করিয়া সকল বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার আশ্বাসের বাণী দুঃখ-দুর্দ্দশার নির্ভরযোগ্য সম্বল বটে এবং তাহাতে উপেক্ষার লেশ নাই সত্য, কিন্তু অপেক্ষা করিলেই যে আশা সফল হইবে, তেমন ভরসার কথা তিনি শুনাইলেন কৈ? দুটো সান্ত্বনার কথায় বিদায় দিয়াই কি তবে তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত কর্ত্তব্য শেষ করিতে চান? এরূপ নানা দুশ্চিন্তা-তরঙ্গ এককালে উত্থিত হইয়া বীণার হৃদয়ের মধ্যে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। নীরদ তাহার চিন্তাকুলতা লক্ষ্য করিয়া যখন নাম ধরিয়া ডাকিল, "বীণে!"—তখন সে চমকিত হইয়া দৈন্যভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া শুধু বলিল, "আমার—আমার—আমি কি আর কিছু বুঝি নে! আচ্ছা, তাই হোক্ তবে!"

নীরদ তাহার নিরাশাকুল নিষ্প্রভ মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, "না, তুমি বোঝ নি বীণে! আচ্ছা, এখন থাক্, পরে বোঝ্‌বে।"

বীণার পূর্ব্ব সঙ্কল্পই স্থির রহিল; মাত্র তিন দিন নীরদদের গৃহে থাকিয়া সে মামার বাড়ীতে যাত্রা করিল। যাইবার কালে সত্যবতীর নেত্র সজল হইল; কিন্তু পরের মেয়েকে অভিভাবকের অমতে ঘরে রাখিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন না। বীণার চিত্তও তখন সুস্থ ছিল না। সে ভাবিতেছিল, 'এমন দয়াবতীর আশ্রয়ে যাহার স্থান হইল না, তাহার ভাবী সুখের কামনা স্বপ্নই বটে। যেখানে আশ্রয় লইতে যাইতেছি, সেখান হইতেও বিতাড়িত হওয়া অসম্ভব কিছুই

নয়। ভগবান জানেন, পোড়া অদৃষ্টে কত দুঃখ-দুর্দ্দশা লেখা রহিয়াছে!' সে সত্যবতীকে প্রণাম করিয়া মস্তকে তাঁহার পদ-রেণু তুলিয়া দিলে তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সতী-লক্ষ্মী হও, চির আয়তির বেশে ঘর উজ্জ্বল করো।"

কিন্তু সত্যবতী অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন এবং ক্ষোভ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "নীরদকে প্রণাম করো!"

নীরদ বীণাকে বাধা দিয়া বলিল, "আমি তোমার চেয়ে বড় কিসে বীণে! হাতে নমস্কার কর্‌লেই সখ্যটা বোঝায় বেশী।"

সখ্য?—এ সখ্যটা কি? বীণা তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; পক্ষান্তরে তাহার মুখে অস্পষ্ট বেদনার রেখা ফুটিল এবং হৃদয়ে প্রচণ্ড বেগে আশা-নিরাশার ঝড় বহিল!—তাহাতে তুমুল তোলপাড় আরম্ভ হইয়া গেল! অতিকষ্টে সে তাহার বেগ সম্বরণ করিয়া নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল,—নেত্র-কোণে দুই বিন্দু মুক্তা ঝল্‌-মল্‌ করিতে লাগিল!

সত্যবতী শান্তস্বরে বলিলেন, "না, ও প্রণাম কর্‌তে পারে, তুই বয়সে বড়।"

ভরসা পাইয়া বীণা নীরদের পদ-প্রান্তে পতিত হইল, যেন অসাড় অনড় প্রাণহীন দেহটা ঝুপ্‌ করিয়া পড়িল! নীরদ পেছন দিকে সরিয়া গিয়া বলিল, "দুদিনের আশ্রয় ভেঙ্গে গেল বলে দুঃখ করোনা, বীণে! যাতে তোমার চিরদিনের আশ্রয় হয়, আমি তাই চাচ্ছি।"

বীণা ফিরিবার কালে পিত্রালয়ে গিয়া হরিপ্রিয়াকে প্রণাম করিয়া বলিল, "জ্যেঠাই-মা, মামার বাড়ী যাচ্ছি; কবে ফিরবো, কে জানে? তাই পদ-ধূলি নিতে এসেছি।"

হরিপ্রিয়া সহর্ষে বলিলেন, "এসেছো মা!—বেশ করেছো। চৈত্রিমাসে শেয়াল-কুকুরও বাড়ী-ছাড়া হয় না। আমি কেবল তোমার কথাই ভাবছি। আরো ক'দিন পরে গেলে হয় না, মা? আমি নিজেই খরচ দিয়ে তোমায় পাঠিয়ে দেবো।"

বীণা সসঙ্কোচে বলিল, "না, জ্যেঠাই-মা; মামার বাড়ী যাবো বলে পাল্কী করা হয়েছে, তা আর ফেরানো চলে না।"

বীণা তাহার পিতার রুদ্ধদ্বার গৃহটার দিকে চাহিতে চাহিতে বিমর্ষচিত্তে পাল্কীতে গিয়া বসিল। বাহকগণ তাহা স্কন্ধে উঠাইয়া নানারূপ অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল। মামার বাড়ীতে যাইবার কালে নীরদ পাথেয় বাবদে বীণাকে পঁচিশ টাকা দিয়াছিল। তাহা হইতে পাঁচ টাকা পাল্কী-ভাড়া দিয়া হাতে রহিল বিশ টাকা। হাত-খরচের জন্য চাহিয়া মামী-মা তাহার নিকট হইতে মাঝে মাঝে টাকা, দেড়-টাকা করিয়া নিতেন। তাহাতে তিন মাসের মধ্যেই বীণার হাতের সম্বল ফুরাইয়া গেল। মামী-মা যখন টের পাইলেন, বীণার হাতে আর কিছুই নাই, তখনই তাঁহার স্নেহের জোয়ারে ভাটা পড়িল এবং তাঁহার অল্প-আয়-বিশিষ্ট পরিবারে আর একজনের ভরণ-পোষণ যে নিতান্ত ভার-জনক, তাহা কথা ও কাজে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীকেও চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "তের চৌদ্দ বছরের এ ধেড়ে মেয়েটার রং আর কিছু দুধের

মতন ফর্‌শা নয়। এ মা-বাপ-খেকো মেয়েটাকে পার কর্‌তে হলে কম পক্ষে ডেড় হাজারের দরকার; টাকা কোথেকে আস্‌বে?”

মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে মামা অন্যমনে বলিলেন, “তাইতো!”

কিন্তু মামাকে কিছুই বলিতে হইল না। তিনি বিদায়ের বাণী স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার আগেই বীণা নিজের পথ নিজে ধরিল,—তাহার অপর আশ্রয় মাসীর বাড়ীতে স্থান হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গমন করিল। বলা বাহুল্য, সে মনে মনে আপনার অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিল! নীরদের শেষ কথাটাও তাহার মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার তপ্তশ্বাস বক্ষ হইতে বিমুক্ত হইল।

মাসীর বাড়ীতে বিধবা মাসী-মার খাঁটি আদর-যত্নে বীণা শান্তিতে কাল যাপন করিতেছিল বটে, কিন্তু আর একটা কারণে তাহার সে-সৌভাগ্য ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। তাহার মেসতুত ভাই বিনোদের ইয়ার-বন্ধুগণ সে বাড়ীতে সর্ব্বদা তাস খেলার আড্ডা করিত। তাহাদের উৎপাতের মাত্রা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং বীণা সে-বাড়ীতে আসিবার পর হইতে বিশেষরূপেই তাহা বাড়িল। তাহারা পান খাইতে, জল চাহিতে, অনেক সময়ে বিনা কাজেও বাড়ীর মধ্যে যাইত আর কদর্য্য দৃষ্টিতে বীণার দিকে চাহিত। তাহাদিগকে দেখিলেই বীণা অন্তরালে সরিয়া গিয়া আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তথাপি নিস্তার পাইত না। ‘বীণু! এটা দাও, ওটা নেও’—ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাহাকে তাহারা কাছে ডাকিত,

বিনোদের মাতা বারণ করিলেও তাঁহার কথা তাহারা কাণে তুলিত না। বীণা অসহ্য দুঃখে কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইত,—অশ্রুই ছিল তাহার সম্বল আর সান্ত্বনা!

একদিন একটী ভ্রষ্ট যুবক বীণাকে একাকী পাইয়া "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ;"—বলিতে বলিতে তাহার একখানা পা জড়াইয়া ধরিল। বীণা তাড়াতাড়ি সজোরে পাটা টানিয়া লইয়া সেই নর-পিশাচকে নিদারুণ পদাঘাতে চিহ্নিত করিয়া দিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে আরক্ত চক্ষে মাসীর ঘরে গিয়া উঠিল।

বীণার এখন নূতন আশঙ্কা, নূতন উপসর্গ! সেটা হইল তাহার রূপ-লাবণ্য। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই বিষম দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার তাহার হৃদয়ে ঘনীভূত হইতেছিল। সে সময় সময় ভাবিত, এখনি কি আমার সে বয়স আসিল? যদি আসিয়াই থাকে, উপায় কি? কোথায় যাই, কিরূপেই বা আত্ম-রক্ষা করি? অগতির গতি ভগবানের দয়া-দৃষ্টি ছাড়া হতভাগিনীর আর অন্য গতি কি? যিনি গতি করিবেন বলিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, তিনি কি এখনো আমার কথা ভাবেন? ভাবিলে নিশ্চয়ই একটা উপায় হইত, সম্ভবতঃ তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। হে দয়াময় প্রভো! তুমিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দয়া করিয়া তুমিই একটা গতি কর।

কিন্তু যখন ভগবানের দয়ার কোনরূপ সাড়া বীণা পাইল না, তখন একটি অসহায়া তরুণীর মনোভাব যে আকার ধারণ করে, বীণারও তাহাই হইল। সে মনে মনে নীরদের নিষ্ঠুরতায় দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার মনের করুণ-কঠোর উক্তিগুলি

নিতান্ত তীব্র হইলেও তাহা দ্বারাই তাহার একান্ত আপনার যিনি, তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে সঙ্কল্প করিল। সে ভাবের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া তখন-তখনি একখণ্ড কাগজে নীরদের নির্ম্মম চরিত্র অঙ্কণ করিতে বসিল এবং তাড়াতাড়ি দুই তিন পংক্তি লিখিয়াও গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দারুণ ক্ষোভে ও অভিমানে চক্ষুদ্বয় সিক্ত হইয়া ফোঁটা তিন চারি অশ্রু লেখার উপরে ঝরিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কলমটাও শিথিল অঙ্গুলীর বেষ্টন হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া বীণা আর একখানা কাগজ লইল এবং দৃঢ়করে লেখনী ধারণ করিয়া অতি কষ্টে লেখাটা সমাপ্ত করিল। তারপরে খুব মন দিয়া লেখাটা সে আগা-গোড়া একবার পড়িল, কিন্তু তাহাতে তেমন তৃপ্তি পাইল না, তাই আবার পড়িতে লাগিল। এবার পাঠ সমাপ্ত হইলে সে বিষণ্ন মনে ভাবিতে বসিল।

সে মনে মনে বলিল, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এতগুলি তীব্র কটূক্তি অনায়াসে লিখিলাম, তিনি এ পত্র পাঠ করিয়া হয়ত অসহ্য মনোবেদনায় অভিভূত হইবেন। ইহাতে নিশ্চয়ই তিনি আর আমার প্রতি প্রীতি-রক্ষা করিবেন না; তাহার ফল কি হইবে? এরূপে তাঁহার চিত্তকে আহত করিবার আমার অধিকারই বা কি? তাঁহার মত ধীর ব্যক্তি আমার এ চিত্ত-বিক্ষোভকে বালিকা-সুলভ চাপল্য বলিয়া অবজ্ঞাও করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতেই বা আমার মান থাকে কৈ? আর তাঁহার মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে যাওয়াও যে আমার ন্যায় অবোধ মেয়ের পক্ষে

যার-পর-নাই ধৃষ্টতা! ছি! আমি এ কি করিতেছি? এ চিঠিখানা ত আর জ্যেঠামহাশয়ের চাল-চতুরতার মধ্যপথে অন্তর্হিত হইবে না; আজ না হউক, কাল নিশ্চয়ই তাঁহার হাতে পৌঁছিবে। তখন তিনি আমার এ কদর্য্য ভাষাটাকে কত মতেই না উপভোগ করিবেন! না—না, এ কিছুতেই পাঠান হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া বীণা তখন-তখনি টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ আতঙ্ক ও আশঙ্কার অন্ধকার তাহার বক্ষে জমাট বাধিয়া উঠিল! তারপর একটী গভীর নিশ্বাস মোচন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যুক্তকরে অন্তর্য্যামীকে অন্তরের নিবেদন জানাইল; বলিল, 'হে ঠাকুর!—হে জগন্নাথ! তুমি জগতের সকলের আশ্রয়, এ অনাথাকে আশ্রয় দেও। সে পথ যদি কণ্টকিত, তবে কোন পথে কোথায় নিবে, তুমিই ত জান।'

বীণা তখনও জানে না যে, তাহার কাতর প্রার্থনা সত্য-সত্যই দয়ালু ভগবানের চরণতল স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার ভাবী মঙ্গলের পন্থা সুপ্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার ভাবনাময় চিত্তের উত্তাল স্পন্দন তখনও থামে নাই, তাই সে অনুচ্চ-স্বরে আবার আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "দূর ছাই! কত কি অলীক কথাই না মনে আসে! আমি বামন, তবু চাঁদ ধর্‌তে হাত বাড়াতে চাচ্ছি! একবার ত বিতাড়িত হয়েছি, আবার সে স্বপ্নে সাধ যায় কেন? না—না, ভগবান্! যাতে ভালো হবে, তুমিই করো; আমি যে নেহাত অবোধ, আনাড়ি!—যার-পর-

নাই অসহায়! তুমি আশ্রয় না দিলে আমার গতি কি হবে!” দারুণ ক্ষোভে ও নিরাশায় ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া বীণার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল, মুখে আর কথা সরিল না।

এদিকে সত্যবতী তিন দিনের মধ্যেই বীণার গুণে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া গৃহ-কর্ম্ম-নিপুণা পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটীর উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বীণা বিদায় লইবার কালে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রাণের কথা এবং সে কথাটা সফল করিতে তিনি স্বয়ং উদ্যত হইলেন। বীণা মামার বাড়ীতে যাইবার কয়েকদিন পরেই সত্যবতী নীরদকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমি বউ করে বীণাকেই ঘরে আন্‌বো, একটা তারিখ ঠিক কর্‌তে হবে।”

নীরদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “কয়েকমাস পরে ছাড়া ত হতে পারে না, মা! এখন যে হাতে টাকা নেই!” অগ্রহায়ণের আট তারিখে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ নিজ বাড়ীতেই হইল এবং হরিমোহন বিশ্বাসই কন্যাদান করিলেন। সত্যবতী গোপনে তাহাকে কয়েকটী রৌপ্য-মুদ্রা দিতে বলিয়াছিলেন; তাহাতেই ইহা সম্ভব হইল।

বিবাহের পর বীণা বড় আশায় বুক বাঁধিয়া মনের আনন্দে গৃহ-কর্ম্ম আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু যখন তাহার বাল্য-সখী মনোরমা ঝড়ের মতন হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইল, তখন তাহার সে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া বীণার নিদারুণ আশঙ্কা হইল এবং সে নানা দুশ্চিন্তায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরমে মরিতে লাগিল!

১৫

নীরদের বিবাহের পাঁচসাতদিন পরেই ভুবনের বিবাহের সাড়া পড়িল ; কিন্তু বিবাহ হইল তিনমাস পরে। ভুবন বি-এল পরীক্ষায় ফেইল হইয়া পিতার তাড়নায় আবার হাইল ধরিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আর পরীক্ষা-সাগর অতিক্রম করিতে হয় নাই, পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে পাঠের হাইল ছাড়িয়া দিয়া বিষয়ের হাইল দৃঢ়করে চাপিয়া ধরিতে হইয়াছিল। কালীমোহনবাবু জীবিত থাকিতেই প্রতাপপুরের ডাক্তার কেশববাবু তাহার মাতৃহারা দুহিতা মনোরমাকে ভুবনের করে সমর্পণ করিবার জন্য নগদ আটশ, গহনায় চারশ এবং ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রে তিনশ দিতে চাহিয়াছিলেন। কালীমোহন বাবু বলিয়াছিলেন, নগদ আরও দুইশ পণবাবদে পাইলেই এ সম্বন্ধ করিবেন। কেশববাবুও সে কথায় এক প্রকার রাজী হইয়াছিলেন। তথাপি তখন কেন বিবাহ হইল না, তাহার একটু বৃত্তান্ত বলিতেছি।

যদিও তিন বন্ধুর কৈশোর স্বপ্ন শূন্যোদ্যানের মত অলীক ঠেকিয়াছিল, তথাপি দেশের হাই স্কুলের কাজে রত হইয়া তিন বন্ধুকে নূতন একটা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞাটা নীরদ ও বলাই যেরূপ অন্তরের সহিত করিয়াছিল, ভুবন তেমন করে নাই ;

কারণ প্রতিজ্ঞাটা ছিল অর্থ-বিষয়ক আর স্বার্থত্যাগ-মূলক। নীরদ প্রস্তাব করিয়াছিল, 'আমরা—যুবক-সভার সভ্যগণ যখন দেশ-হিতকামী এবং সংস্কারের পক্ষপাতী, তখন আমরা পণ না লইয়াই বিবাহ করিব; তাহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব লোকের অশেষ উপকার হইবে; পক্ষান্তরে দেশের যুবক দিগকেও একটা দৃষ্টান্ত দেখান হইবে।' বলাই ও অন্য কয়েকটী যুবক ইহা অন্তরের সহিত সমর্থন করিয়াছিল, কেবল ভুবন ও তাহার জনৈক আত্মীয় ইহার বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তি উঠাইয়াছিল। কিন্তু কিছুই টিকে নাই; নীরদের প্রস্তাবই শেষে যুবক-সভায় গৃহীত হইয়াছিল। যে দিন প্রস্তাবটীর আলোচনা হইয়াছিল, সে দিনের রাত্রিতেই বিবাহ-সম্বন্ধে ডাক্তার কেশববাবুর সহিত কালীমোহন বাবুর কথোপকথন হইয়াছিল এবং ভুবন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার পিতা আপাততঃ সম্মত না হইলেও এ বিবাহ অচিরে সম্পন্ন হইবে। সুতরাং যুবক-সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ভুবনই সর্ব্বাগ্রে তাহার অন্যথাচরণ করিলে বিশেষ লজ্জার কারণ হইবে, ইহা ভাবিয়া সে বড়ই চিন্তিত হইয়াছিল এবং নিন্দার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য গুরুতর প্রয়োজন জানাইয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল। তাহার অল্পকাল পরেই কালীমোহন বাবু কলেরায় পরলোক গমন করিলেন। তখন ভুবনকে বাড়ীতে ফিরিতে হইল এবং তাহার পিতার সমুদয় ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া সংসার পরিচালন করিতে হইল।

একদিন বৈকালে বৈঠকখানায় বসিয়া ভুবন পিতার আমলের খাতা-পত্রগুলি উল্টাইয়া দেখিতেছিল; একজন গোমস্তা পাশে

বসিয়া আমদানী-তলববাকীর হিসাব বুঝাইতেছিল। ভুবন বলিল, "আমি দেখ্‌তে চাচ্ছি, বাবা টাকা ওঠাবার কালে রেয়াত-বাদ বলে কিছু ছাড়্‌তেন কি না।"

গোমস্তা সসঙ্কোচে বলিল, "আজ্ঞে, তিনি রেয়াত প্রায়ই কর্‌তেন না। যখন দেখ্‌তেন, নেহাত কিছু ছেড়ে না দিলে চল্‌বে না,—টাকা ওঠান যাবে না, তখুনি সামান্য কিছু ছেড়ে দিতেন।"

"সামান্য কিছু রেয়াত করাও আমার মত নয়। আপোসে আদায় না হয়, নালিশে ত হবে? তবে আর তা কর্‌তে যাওয়া কেন?"

"আজ্ঞে, সবটাকা—নালিশে আদায় কর্‌তে গেলে, ঝঞ্ঝাট বেশী হয়, ঘরের টাকা বার করে দিতে হয়, আদায়ও শীগ্‌গির হয় না। আর কিছু কড়া সুদে লগ্নি কর্‌তেন বলেই, তিনি কিছু কিছু ছেড়ে দিতে চাইতেন।"

"ইস্! সুদ কড়া ত বেজায়!—টাকায় তিনপয়সা, সাড়ে-তিন পয়সা মাত্র! টাকায় দু' আনা, দশ পয়সা করে হলে কড়া বলা চলে।"

"আজ্ঞে, তিনি খতে আসল টাকা যা লেখাতেন, সব একত্র না দিয়ে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করে দিতেন। আবার সুদ যা দেবার কথা থাকৃত, অনেক সময় তার চেয়ে কিছু বেশী খতে লেখাতেন। এ রকমস্থলেই খাতক বিশেষ কান্না-কাটা কর্‌লে, সুদের থেকে কিছু বাদ দিয়ে দাবী আদায় কর্‌তেন।"

"বাবা বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবী ছিলেন। বড্ড দুঃখ র'ল, তাঁর মত পাকা বিষয়ীর কাছে বিষয়-কর্ম্ম শিক্ষার সুযোগ পেলাম্ না। সেজন্য আজীবন ভোগ্‌তে হ'বে, সন্দেহ নেই।"

"ভুবনবাবু যে নিবিষ্ট মনে বিষয়-বিষ পান কচ্ছ; বিষে ধর্‌লে ত নিশ্চয়ই ভোগ্‌তে হবে"—বলিয়াই চন্দ্রকুমার ঘরে উঠিয়া ভুবনকে হাতে একটী নমস্কার করিল। তাহার পেছনে নীরদও দেখা দিল।

সেদিন হাফ্‌-স্কুলের ছুটীর পর নীরদ চন্দ্রকুমারকে লইয়া যুবক-সমিতির চাঁদা আদায় করিতে ভুবনের নিকট গিয়াছিল। চন্দ্রকুমারকে ক্ষুদ্র একটী প্রতি-নমস্কার করিয়া ভুবন গম্ভীর স্বরে বলিল, "বিষয়ে বিষ থাক্‌লেও সকলের কাছে নয়। হাঁসের মত বেছে পান কর্‌তে জান্‌লে, বিষের ভয় যে মোটেই থাকে না।"

চন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা তোমার যেন সে ভয় নেই, ভাই;—নীলকণ্ঠের কিছু ভয় থাকেও না। কিন্তু আমাদের একটা মস্ত ভয়ের কারণ রয়েছে! মোহিনীর মোহে যে মহাযোগীরও মতিভ্রম হয়েছিল।"

ভুবন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি কি বলতে চাচ্ছ, আমি বিষয়ের মোহে সব কাজে ভুল করে বস্‌বো?"

চন্দ্রকুমার কিন্তু উচ্চ হাস্য করিল না, ঈষৎ হাসিল; বলিল, "টাকায় কি না করে, ভাই। টাকার মোহে সকল শুভ সঙ্কল্প স্বার্থের অগাধ সলিলে ডুবে যায়!"

নীরদ স্নিগ্ধ-মধুর-কণ্ঠে বলিল, "ভুবনের সঙ্গে কথায় কথায় তোমার আড়ি, ভাই! সে ত অশিক্ষিত নয় যে, টাকার

মায়ায় কর্ত্তব্যে অবহেলা কর্‌বে। তুমি ওকে কি সাবধান কর্‌ছ ?”

ভুবন গম্ভীরস্বরে বলিল, “তা সাবধান করা মন্দ নয়; এটা ত বন্ধুরই কাজ! তবে টাকার মোহে আমি যে একটা অকার্য্য করে বস্‌বো, তা না ভাবাই তোমাদের উচিত।”

চন্দ্রকুমার বলিল, “বেশ, তবে এখন কাজের কথাই হোক্‌। তোমার চাঁদাটা ত তিনমাসের বাকীতে পড়্‌লো। আজ পাওয়া যাবে কি ?”

ভুবন মাথা নাড়িয়া বলিল, “না ভাই, আজ পাবেনা;—তহবিল শূন্য।”

সেদিন এখানেই কাজের কথা শেষ হইয়াছিল। তৎপর নানা গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া সন্ধ্যাকালে উভয়ে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

তারপর এক মাস অতীত না হইতেই ডাক্তার কেশববাবুর একমাত্র কন্যা মনোরমার সহিত ভুবনের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। ভুবন পূর্ব্ব কথায় রাজী হয় নাই, তাহার অনেক কর্ম্মচারীকে ডাক্তার বাবুর নিকট পাঠাইয়া জানাইয়াছিল, সে পণ বলিয়া কিছুই লইবে না, কিন্তু সে যে একটা কারবার ধরিতে যাইতেছে, তাহার সাহায্য বাবদে মাত্র দেড় হাজার টাকা দিতে হইবে, আর স্ত্রীর গহনা ও যৌতুকের ফর্দ্দ তাহার পিতা যেমন দিয়াছিলেন; তেমনি থাকিবে। ডাক্তারবাবু জামাতার দাবীর কথা শুনিয়া প্রথমতঃ নিরাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরাশ হইয়াও নিষ্কৃতি নাই, বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে।

অনেক ভাবিয়া তিনি দেখিলেন, বি-এ-পাশকরা এমন সঙ্গতিপন্ন ছেলে পাওয়া ভার; তাই জামাতার প্রস্তাবই শেষে শিরে তুলিয়া লইলেন এবং আজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেও কুলায় না দেখিয়া পাঁচশ টাকা ঋণ করিয়া মেয়ে পার করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সুযোগ্য পাত্র হাত-ছাড়া হইলে পাছে বিদুষী কন্যাকে অপাত্রে ফেলিতে হয়, সে আশঙ্কায় ডাক্তারবাবু স্বয়ং ভুবনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সকল আবদার পূরণ করিবেন, জানাইলেন এবং কথা পাকা করিয়া তারিখও নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

সেই দিবসই ভুবন যুবক-সভার সম্পাদকের নামে একখানা চিঠি দিয়া জানাইল, সে বিষয়-কর্ম্মে এমনি ব্যস্ত যে, বাহিরের কোন কাজেই মন দিবার মত অবসর আর নাই। কাজেই সভ্যদের নামের তালিকা হইতে যেন অবিলম্বে তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। সম্পাদক চন্দ্রকুমার মজুমদার চিঠি পাইয়াই নীরদের কাছে ছুটিয়া গেল। চিঠিখানা পড়িয়া নীরদ হাসিয়া বলিল, "ওর মাথায় আবার কোন্ খেয়াল চাপ্‌লো?—চলোনা একবার, জেনে আসা যাক।"

"চলো ভাই, খাতাটাও সঙ্গে নিব। আমরা সবাই চাঁদা দিলাম, সেত আজ যাবত একটী কপর্দ্দকও দিলে না। বাকী যে পাঁচ মাসে পড়্‌লো।"

"খাতা বয়ে নিয়ে আর কি হ'বে? মুখেই ত বল্‌তে পার্‌বে।"

যাইবার কালে পথে রাসবিহারী নামক আর একজন মেম্বারের নিকট তাহারা শুনিল, ভুবনের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে;

সেজন্যই সে আর সমিতির মেম্বার থাকিতে চাহিতেছে না। নীরদ আদৌ সে কথা বিশ্বাস করিল না ; কিন্তু চন্দ্রকুমার তাহাকে বুঝাইয়া দিল, ধাপ্পাবাজ লোকের ব্যবহারটা বাহিরে শিষ্টতার পোষাকে ঢাকা বটে, কিন্তু ভিতরে সে দুষ্ট অভিসন্ধি পোষণ করে। সুতরাং তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।

তিনজনে ভুবনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ফরাসের বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়াছে ; সম্মুখে টাকা-পয়সা, সিকি-দুয়ানি প্রভৃতি সারি সারি সাজান ; পাশে গোমস্তা খাতা লিখিতেছে, অদূরে চারিখানি বেঞ্চের উপর বিশ-বাইশ জন লোক বসিয়া দেনা-পাওনার কথা বলিতেছে। আগন্তুক তিনজন তাহাকে হাতে অভিবাদন করিয়া জুতা ছাড়িয়া ফরাসের উপর বসিতেই সেও সকলের উদ্দেশে ক্ষুদ্র একটি প্রতি-নমস্কার করিল। রাসবিহারী বলিল, "খোস্ খবর শুনে ছুটে এলাম্। কোন তারিখে কাজটা হবে, তা চিঠিতে লিখ্‌তে কলমে বাধ্‌লো নাকি, ভুবনবাবু ?"

চন্দ্রকুমার ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "প্রজাপতির খাতায় নাম ওঠ্‌বে বলে, দেশের সমিতির খাতায় তা রাখ্‌তে নেই না কি ?"

নীরদ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "সকলে এককালে এ রকম জটিল প্রশ্ন কর্‌লে, উত্তর পাওয়া যে ভার হ'বে॥ একে একে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই ত কাজটা ভালো হয়।"

ভুবন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না ভাই, বিয়ের কথার তেমন পাকাপাকি এখনো ত কিছু করা হয়নি। হ'লে ত জানাতাম্। আর এই দেখো না, সর্ব্বদা বহু লোকে এসে ব্যতিব্যস্ত করে

তোলে। নিশ্বাস ফেল্‌বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত নেই। সাধ করে কি আমি সমিতির সংস্রব ছাড়্‌তে চাচ্ছি, ভাই ?”

চন্দ্রকুমার সহাস্যবদনে বলিল, “সে জন্যই ত সেদিন বিষয়কে বিষ বলেছিলাম, ভাই! যাক্‌ সে কথা,—যার বিষয়-কর্ম্ম করে সমিতির কাজে মন দেবার অবসর নেই, সে না হয়, তা না কর্‌লে। কিন্তু সেত চাঁদাটা অনায়াসে আদায় করে দিতে পারে! তোমার লোকেরও কিছু অভাব নেই; চাঁদার টাকাটা পাঠিয়ে দিলেই খাতায় উশুল পড়ে। আমাদের হাতে দিলেও চল্‌তে পারে।”

ভুবন মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, “তা ভাই, ওকথা যে মনেই থাকে না! আচ্ছা, ভবিষ্যতে তারি চেষ্টা করা হ’বে।”

চন্দ্রকুমার বলিল, “ভবিষ্যতের পালা ত পরে আস্‌বে; এখনকার দেনাটা আজ মিটায়ে দেও না, ভাই! টাকা ত সাম্‌নেই রয়েছে, পাঁচ মাসের বাকীটা আজ শোধ করে দিতে হবে।”

ভুবন মাথায় হাত দিয়া বলিল, “সর্ব্বনাশ!—এ টাকা কি এখুনি খরচ করা চলে! এ হিসাবের টাকা; হিসাব মত জমা হয়ে তহবিলে পড়্‌বে তারপরে বাবার ব্যবস্থা মত খরচ কর্‌তে হবে। তার একচুল এদিক ওদিক হবার যে যোটি নেই, ভাই।”

চন্দ্রকুমার মুখ ভারী করিয়া বলিল, “তবে কি চাঁদাটা আদায় কর্‌বার তোমার মতলব নেই? তা হ’লে তা স্পষ্ট করেই বলোনা কেন?—আমরা আর মিছামিছি হাটবো না।”

ভুবন মাথা নীচু করিয়া বলিল, "চাঁদা দেবো না কেন ?—একটু রয়ে সয়ে নিতে হবে, ভাই ! তোমাদের কড়া কথা শোন্‌বার ভয়েই ত আমি মেম্বারসিপ্ ছেড়ে দিতে চেয়েছি।"

নীরদ ত্রস্তভাবে বলিল, "না ভাই, মেম্বারসিপ্ ছেড়ে দিলে চল্‌বে না, ওতে যে সমিতি পঙ্গু হয়ে পড়্‌বে। একজনের অভাবেও কাজের অনেক ক্ষতি হয়। আমি তাই সভ্য-সংখ্যা বাড়াতে চাচ্ছি, কমালে চল্‌বে কেন ? তোমার সুবিধে যখন হবে, তখনি না হয় টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ো।"

ভুবন একটু বিনীত ভাবেই বলিল, "পাঠাতে আমার ভুল হ'তে পারে, নীরদ-দা ! তাতে তোমাদের কাজের বড্ড অসুবিধে হবে। তার চেয়ে আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা নিজেরাই এখন কাজ কর্‌তে থাকো, ভাই। আমি কি শেষে তোমাদের মতে সায় না দিয়ে পার্‌বো ?"

চন্দ্রকুমার উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "সায় দিবে কি না, তা তুমিই জানো। কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌ছি, তুমি দেশের কোনো কাজেই লাগ্‌বে না ; বিষয়ের দাসত্ব করে করেই অকর্ম্মণ্য, শেষে জঘন্য হয়ে পড়্‌বে।"

ভুবন চক্ষু রাঙ্গা করিয়া উপর দিকে চাহিতেই নীরদ ভীতি-বিহ্বল-কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল, "ভুবন আমাদের সকলকে ছেড়ে কিছুতেই পৃথক্ থাকতে পার্‌বে না। সে আমাদের সঙ্গে যেতে না চাইলেও আমরা জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাবো ;—ভাবনা কি ?"

এ কথা বলিয়াই নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল। কাজেই অন্য দুইজনকেও কথা ক্ষান্ত করিয়া উঠিতে হইল। তাহারা ঘরের বাহির হইলে ভুবন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "আমার নামটা—তাহ'লে, সমিতির খাতা হ'তে তুলে দিতে যেন ভুল হয় না, নীরদ-দা!"

১৬

যে যুবক-সমিতির সর্ত্ত-পালনের দায় হইতে মুক্তি-লাভের জন্য ভুবন এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শুধু পণ-প্রথার নিবারণ নহে, আরও অনেক সমাজ-হিতকর কার্য্য উহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পল্লী-রাণীর দুঃখ-দৈন্য ঘুচাইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহাও উক্ত সমিতির বৈঠকে আলোচিত হইত। ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী যাহাতে খাইতে না পারিয়া শুকাইয়া মরে, তজ্জন্য নানারূপ ব্যবস্থাও স্থির করা হইয়াছিল। এবং বাঙ্গালীর অনেক সভা-সমিতির মন্তব্যের ন্যায় শুধু কাগজ-পত্রে নহে; কার্য্যতঃ অনেক বিষয়ের চেষ্টা চলিয়াছিল। যুবকগণের অশেষ শ্রদ্ধারপাত্র প্রবীণ পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাসের জীবন-রত্ন অকালে অপহরণ করায়ই তাহারা ম্যালেরিয়ার উপর এমন প্রখর নজর দিয়াছিল এবং সে রাক্ষসীকে হয় মারিয়া ফেলিতে, না-হয় দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে নানা অভিসন্ধি করিয়াছিল। গ্রামের কদর্য্য খাই-খাত-গুলি

বুজাইয়া দেওয়া, পয়ঃ-প্রণালীর সংস্কার করা, জলার জলনির্গমের পথ করিয়া দেওয়া, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা, বর্ষার জল প্রবাহের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া, বাড়ীর আশ-পাশের ঝোপ-জঙ্গল তুলিয়া ফেলা, বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বড় বড় গাছগুলি কর্ত্তন করা, এনোফিলিস্-মশককে বাড়ীর ধারে ডিম পাড়িতে না দেওয়া, সেজন্য জল ও ডাঙ্গার সঙ্গম-স্থলে কেরোসিন তেল ঢালা—ইত্যাদি রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ-পথ্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেবা-শুশ্রূষায় আরাম দান করিবার সুবন্দোবস্তও করিয়াছিল। সুতরাং ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী যুবক-কর্ম্মিগণের নিদারুণ অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া চক্ষে সরিষার ফুলই দেখিতেছিল! শুনা যায়, সে-বৎসর কুইনাইনের চাহিদা কমিয়া গেলে পোষ্টাফিসের নিম্নকর্ম্মচারীদের আপ্‌শোসের সীমা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন কি না, ঠিক বলা যায় না।

সমাজের হিতকল্পে যুবকগণ যেমন পণ-প্রথার নিবারণ করিতে চাহিয়াছিল, সেরূপ চাঁদাদ্বারা একটা সাধারণ তহবিল পরিপুষ্ট করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত নিঃস্ব-লোকদিগকে সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, একাধিক পরিণয় ও বাল্যবিবাহ নিবারণ, বালিকা-বিদ্যালয় ও নৈশস্কুল সংস্থাপন, কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন, স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রচলন, সঙ্ঘ-শক্তির সংগঠন, সাম্প্রদায়িক শিল্পের উন্নতি-সাধন, কৃষি-বাণিজ্য-সমবায় সমিতির গঠন, দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর ও চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-পদ্ধতির পুষ্টিসাধন,

মামলা-মাদক-বর্জ্জন, সাহিত্য-বিজ্ঞানের সবিশেষ অনুশীলন, সাধারণ পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন; দেশীয় ক্রীড়া ও ব্যায়ামানুশীলন, সালিশ-নিষ্পত্তির প্রচলন, বিলাসের ও বিদেশের দ্রব্য বর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্যমূলক আর্য্যধর্ম্মের প্রতিপালন, সাধারণের ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ—প্রভৃতি সমিতির মন্তব্যের খাতায় প্রধান প্রধান বিষয় বলিয়া লিপিবদ্ধ হইলেও উহাদের সফলতার জন্য এক একটী বিষয়ের অন্তর্গত ছোট-খাট অনেক বিষয়েই তাহারা মন দিয়াছিল এবং কার্য্যও কতক আরম্ভ করিয়াছিল। এসব কাজ সম্পূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থ চাই বিস্তর, কিন্তু সেটারই ছিল অভাব। দেশের অধিকাংশ লোক গরীব, তাহারা চাঁদা দিবে কিরূপে? যে দু'চারজন কিছু কিছু দিতে পারেন, তাঁহারাও আপনাকে লইয়া এমনি বিব্রত যে, এদিকে নজর দিবার কি ভাবিবার সময় মোটেই পান না। তাঁহাদের কথা—'দশের যে গতি, আমাদেরও তাহাই হইবে, মৃত্যুকে কে কবে বারণ করিতে পারে? —উহা ত জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।' মোট কথা, তাঁহারা মরিতে প্রস্তুত, তথাপি সমিতির খাতায় কিছুমাত্র জমা দিতে নারাজ। সুতরাং যুবকগণ ঘরে ঘরে মুষ্টি-চাউল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল এবং বলাই উৎসাহী বালকগণকে লইয়া ঐ চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিত। ইহাতে মাসিক প্রায় দুইশত টাকা করিয়া তহবিলে জমিত। তা' ছাড়া সে এককালে হাজার টাকা দিয়া সাধারণ তহবিলটাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। নীরদ, চন্দ্রকুমার প্রভৃতি উৎসাহী যুবকগণও যথাসাধ্য দিয়াছিল; কিন্তু সে সঞ্চিত তহবিল

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই নিঃশেষ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং মুষ্টি-ভিক্ষা-লব্ধ আয়ই শেষে সম্বল রূপে দাঁড়াইয়াছিল; তাহাই যতদূর সম্ভব, সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছিল।

অর্থ ছাড়া শরীর ও মনের শক্তিতে কোন্ দেশ-হিতকর কার্য্যটা সফল করিয়া তোলা যায়, তৎপর যুবকগণ তাহার বিচার করিতে বসিল। তাহারা ভাবিয়া দেখিল, লোকের আন্তরিক আগ্রহ থাকিলেই সমাজ-সংস্কারের কাজগুলি চালান যাইতে পারে এবং সকলের মত না পাইলেও অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। নিজেরা সাহসী হইয়া সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, আর কিছু হউক-না-হউক্, আপনাদিগকে সমাজের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্বরূপে দাঁড় করান যাইতে পারে। ভাবীকালে তাহাতেও সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বটে। সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা পণ করিয়াছিল, নিজেরা বিবাহে পণ লইবে না, নিজ নিজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিবাহ কম বয়সে দিবে না, কৌলিন্যের বড়াই করিয়া অন্যকে ছোট কিম্বা হেয় মনে করিবে না, ছুঁইলেই জাতি নষ্ট হয় এ অন্ধ বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন করিবে না, সমাজের নিম্নস্তরের লোকদিগকে হেয় কিম্বা অপবিত্র বলিয়া নিন্দা বা অনাদর করিবে না। সভ্যদের অধিকাংশ শুধু বাক্যে নহে, কার্য্যেও এইরূপই করিয়া আসিতেছিল এবং তাহারা 'সমাজ-হিতসাধিনী' নামে একটী সাপ্তাহিক সভাও স্থাপন করিয়াছিল। প্রতি রবিবারে উহাতে সমাজ-হিতকর নানা বিষয়ের আলোচনা হইত।

সমাজ-সংস্কারের ন্যায় ধর্ম্ম-সংস্কারের কথাটাও নীরদের মনে একবার জাগিয়াছিল। কিন্তু সহসা এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হাত দিলে পাছে অন্য কাজগুলি অচল হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় সে মনের কথা মুখের বাহির করিতে সাহসী হয় নাই; সে-সঙ্কল্পটা জল-বুদ্বুদের মত তাহার মনে উঠিয়াই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। নীরদ বড় ধীর ও রাশভারি,—সে ভালরূপে না বুঝিয়া ও ফলাফল বিচার না করিয়া কোন কাজে হাত দিবার লোক নহে। কাজেই হিন্দুদিগের সাধারণ ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে একটা খুব কার্য্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হইবার কারণ থাকিলেও আপাততঃ সে সে-সঙ্কল্প স্থগিত রাখিয়া ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র-গঠনের দিকে আগে মন দিয়াছিল এবং তাহা সফল করিয়া তুলিতে কায়মনোবাক্যে সত্যকে অাঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য অবসর পাইলেই জন-সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিত।

এইরূপের একটা কাজ সারিয়া নীরদ এক রাত্রিতে দশটার সময় বাড়ী ফিরিতেছিল; পথে আকবরআলি নামক একটী মুসলমান যুবক. তাহাকে সেলাম দিয়া ক্ষোভ-কাতরকণ্ঠে বলিল, "মাষ্টার-মশাই, বৈকালে আমার ছোট ভাই আবদুলের কলেরা হয়েছে। ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলাম! তিনি বল্লেন, রাত্তিরে চার টাকার কমে রোগী দেখ্‌বোনা। এত টাকা আমরা গরীবে কোত্থেকে দেবো? কি কর্‌বো এখন, ভেবে পাই নে; তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"শান্ত হও—ব্যস্ত হলে চল্‌বে না, আকবর। ডাক্তারকে চার টাকা দিয়েই তবে নেও; ধরো টাকা।" ইহা বলিয়া নীরদ পকেটে হাত দিল।

"এজ্ঞে, ডাক্তারকে এখন আর পায়াই যাবে না; তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই বার হয়ে সৈয়দপাড়ায় রোগী দেখ্‌তে চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন? কখন ফির্‌বেন, কিছু বলেন নি?"

"বলেছেন, রাত্তিরে একটার আগে ফির্‌বেন না। সেখানে নাকি তিন-চারটী কলেরার রোগীকে দেখ্‌তে গেছেন।"

"আরো তিন-চারটে কলেরার রোগী! ম্যালেরিয়া কিছু কমেও দেশটা নিষ্কৃতি পেলে না, কলেরা তার স্থান দখল করে বস্‌লো! আচ্ছা, তুমি এখুনি ছাত্র-সঙ্ঘের সম্পাদক বিনয়ের কাছে ছুটে যাও। সে যেন দু'টী হিন্দু আর একটী মুসলমান ছাত্রকে রোগীর শুশ্রূষার জন্য তোমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দেয়। আমি ঔষধ নিয়ে যাচ্ছি; বাড়ীতে আমার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রয়েছে, তাই এখন দিতে হবে।"

ইহা বলিয়াই নীরদ তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটিল। আকবর আলি সেলাম দিয়া বিনয়ের বাড়ীর দিকে গেল। নীরদ বাড়ী গিয়াই ঔষধের আলমারী খুলিল এবং পকেটে কয়েকটা শিশি গুজিয়া বীণাকে বলিল, "তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ো; আজ রাত্তিরে বোধ হয়, আমার খাওয়া হবে না। রোগী দেখ্‌তে যাচ্ছি; অনিল কোথায়?"

বীণা ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর-পো আধঘণ্টা হ'ল, খেয়ে মুখুয্যেদের বাড়ীতে শুতে গেছেন। সে-বাড়ীর কর্ত্তা নাকি বাড়ীতে নেই।"

"তা'হলে মাকে জানায়ে যেতে হয়।"—বলিয়াই নীরদ দ্রুত-পদে মায়ের ঘরের দ্বারে গিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

সত্যবতী "হুঁ!" বলিয়া সাড়া দিতেই সে ব্যস্তভাবে বলিল, "আমি ও পাড়ায় রোগী দেখ্‌তে যাচ্ছি, আজ রাত্তিরে নাও ফির্‌তে পারি,—বলে যাচ্ছি।"

সত্যবতী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিসের রোগী দেখ্‌তে চল্লি এত রাত্তিরে? খাওয়াও ত হয় নি। যেতে হয় খেয়ে যা না; তা না হলে বৌরও তো খাওয়া হ'বে না।"

নীরদ পূর্ব্ববৎ ব্যস্ততার সহিত বলিল, "আমি ওকে খেতে বলেছি। কলেরার রোগী;—এখুনি না গেলে নয়।"

পুত্র গভীর রাত্রিতে কলেরার রোগী দেখিতে যাইতেছে শুনিয়া মায়ের কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার মুখে সে ভাব প্রকট হইল না। তিনি শান্ত-সহজ সুরে বলিলেন, "দিনভর খেটে খেটে হয়রাণ হয়ে এসে কোথায় রাত্তিরে একটু বিশ্রাম কর্‌বি; তা না করে, না খেয়েই চল্লি এখ্‌খুনি রোগী দেখ্‌তে; তাও কলেরার রোগী! কলেরার রোগীকে দেখে এসে খাওয়া তো নিষেধ! আর তুই না খেয়ে গেলে যে বৌর মুখেও ভাত ওঠ্‌বে না। ভাত-তরকারিগুলো পচে অযথা নষ্ট হবে। তাই বল্‌ছি, খেয়ে একটু বিশ্রাম করে যা।"

নীরদ কদাচ মাতার কথা লজ্ঘন করে নাই, আজও করিল না। সে তাড়াতাড়ি কয়েকগ্রাস নাকে মুখে গুজিয়া দিয়া এক গ্লাস জল খাইল। তারপর মুখটা ধুইয়াই রোগী দেখিতে লণ্ঠণ হাতে যাত্রা করিল। তাহাকে যাইতে দেখিয়া সত্যবতী ডাকিয়া বলিলেন, "একটু সাবধানে থাক্‌বি, যেন স্বাস্থ্যটা ঠিক থাকে। শরীর ভাঙ্‌লে পরে যে কোনো কাজই চল্‌বে না। কতদূরে যেতে হ'বে ?"

নীরদ তখনি থামিল, বলিল, "আমার জন্যে কিচ্ছু চিন্তে করো না, মা! তোমার আশীর্ব্বাদে ছেলেটাকে বাঁচায়ে ওঠাতে পার্‌লে হয়। আহা! গরীবের ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে! যেতে হবে ডেড় ক্রোশ উত্তরে—একটা মুসলমান-পাড়ায়।"

"সেদিকে তো মুসলমান ক'টাই কলেরায় মারা গেছে; আরো রোগী আছে তবে! মুসলমান বেচারাদের ওপরই দেখ্‌ছি এবার ঠাকুরের কোপটা বেশী হয়েছে! ঠাকুর কবে ওপাড়া ঠাণ্ডা কর্‌বেন।" বেদনা-জড়িত কণ্ঠে ইহা বলিয়া সত্যবতী একটী গভীর নিশ্বাস মোচন করিতে লাগিলেন।

"গরীব বলে ওরা স্বাস্থের প্রতি যত্ন নিতে পারে না, মা; অনেকে শিক্ষার অভাবেও যত্ন নিতে জানে না। তারপর অনেক পুকুরেরই জল কমে, কদর্য্য হ'য়েছে, তা'ই পান কর্‌তে হচ্ছে! তার ফলে রোগেও পড়্‌তে হচ্ছে।"

"ওপাড়ার পুকুরগুলোর দিকে বলাই নজর দিচ্ছে না কেন? এ দিগ্‌কার পুকুরগুলো ত ওর চেষ্টায় বেশ ভালো হ'য়েছে। তাতেই এদিগ্‌কার ম্যালেরিয়া বলো, কলেরা বলো, অনেকটা কমেছে।"

"সে একা আর কত কর্‌বে, মা? সমিতির তহবিল শূন্য, আমরা তাকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছি নে। আস্‌ছে বছরে ওদিকে কিছু কিছু কাজ চল্‌তে পারে, সে চেষ্টা আমরা অবশ্য কর্‌বো।"

"তা না কর্‌লে চল্‌বেনা, ঠিক্। থাক্ এখন সে কথা। তুই রোগীকে অষুধ দিয়েই তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌বি; নতুবা আমরা বড্ড চিন্তিত থাক্‌বো।"

"আচ্ছা মা, আস্‌বো"—বলিয়াই নীরদ দ্রুতবেগে হাটিয়া চলিল।

পরদিন বেলা এগারটার সময়ও নীরদ ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া সত্যবতীর কোমল চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অনেকবার ঘর-বাহির করিলেন, তারপর দরজার ধারে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতে লাগিলেন, নীরদ ফিরিয়া আসে কি না; কিন্তু তাহাকে দেখা গেল না। এদিকে ঢং-ঢং করিয়া নীরদের ঘরের ঘড়ীতে বারটার শব্দ হইল। পরে একটা, তারপরে দুইটাও বাজিল; তথাপি সে ঘরে ফিরিল না দেখিয়া সত্যবতীর প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, মুখখানাও কালি হইয়া গেল! তিনি পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উদ্বিগ্নমনা বীণা এতক্ষণ অপ্রসন্ন মনে হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার পুস্তকখানা খুলিয়া কলেরা-চিকিৎসার প্রণালীটা দেখিতে-ছিল। দেখিতে দেখিতে অক্ষরগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া উঠিল! অবস্থা শেষে এমন দাঁড়াইল যে, অক্ষরের আকার আর তাহার দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না; সব যেন ধুইয়া মুছিয়া একাকার—শাদা হইয়া

গিয়াছিল! যাহার মন পাঠ্য বিষয় ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে, তাহার পুস্তক-পাঠ ঐরূপেই শেষে সমাপ্ত হইয়া থাকে!

হঠাৎ একটা ধপ্-ধপ্ শব্দ বীণার কাণে গেল। সে তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, নীরদ ঘরের দিকে আসিতেছে। তাহার বামহাতে লণ্ঠন ও জুতা, ডানি হাতে ভিজা জামা-চাদর। স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই বীণা চমকিত হইল; কারণ তাহা অতিমাত্রায় বিষণ্ণ, চক্ষুদুটী রক্তিম। বীণা তাড়াতাড়ি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া তাহার হাতে দিল।

নীরদ ভিজাকাপড় ছাড়িয়াই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং অবসাদের সুরে নানারূপ অব্যক্ত আর্ত্তশব্দ করিতে লাগিল। স্বামীর গায়ে জ্বর আসিতেছে, ইহা বুঝিতে বীণার দেরী হইল না; সে তখন-তখনি গিয়া শাশুড়ীকে সে সংবাদ জানাইল। সত্যবতী আসিতে ক্ষণকাল বিলম্ব হইল; বীণা ইত্যবসরে স্বামীর গায়ে একখানা কম্বল জড়াইয়া দিল।

সত্যবতী আসিয়া নীরদের গায়ে হাত দিয়া বিষণ্ণমনে বলিলেন, "গা ত বেশ গরম হয়েছে; জ্বর আস্বার আর দেরী নেই।"

নীরদ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "না মা, আমার জ্বর-টর কিছু হবে না, তুমি ও চিন্তা মনে এনো না। কাল রাত্তিরে অনিদ্রা করেছি বলে মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ কর্ছে; তাতেই একটু অসুখ বোধ হচ্ছে।"

"যে ছেলেটাকে দেখ্তে গেলি, ওর কেমন হ'ল?"

"সে হতভাগাকে বাঁচাতে পার্লাম্ না, মা! রাত্তিরে অবস্থা মন্দ ছিল না। আজ সকাল-বেলা থেকে আবার রোগ বাড়্তে

থাকে,—নানা উপসর্গ দেখা দিয়ে। কেশববাবুকেও ডাকান হয়েছিল। উভয়ে চেষ্টা করে দেখ্‌লাম্‌, কোন উপসর্গই আর কম্‌লো না। শেষে বারোটার সময় সে সকলের মায়া কাটায়ে চলে গেল।”—বলিয়াই নীরদ কম্বলের কোণে চক্ষু মুছিল; তাহার রক্ত-চক্ষুদ্বয় বর্ষণ-স্নাত জবাফুলের মত সিক্তোজ্জ্বল হইল। যে জ্বরটাকে জোর করিয়া সে এতক্ষণ চাপিয়া রাখিতেছিল, তাহার বেগ অত্যন্ত অধিক হইল; শরীর ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! বীণা লেপ আনিয়া তাহার গাটা ভাল-রূপে ঢাকিয়া দিল। বধূকে সেখানে থাকিতে উপদেশ দিয়া সত্যবতী অনিলকে ডাকিতে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

বীণাকে কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নীরদ শোক-বিহ্বল-কণ্ঠে বলিল, “কোন্‌টা সত্য বীণে,—জীবন, না মরণ?”

বীণা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অবনত মুখে বলিল, “জীবিত লোকের কাছে জীবনটাই ত সত্য। যে মরেছে, তার কাছে জীবনের মূল্য কিছু নাও থাক্‌তে পারে,—তাও ঠিক্‌ বলা চলে না। কিন্তু যিনি নানা সৎকর্ম্ম করে’, শেষে মৃত্যুর সাহায্যে স্বর্গলাভ করেন, তাঁর কাছে জীবন-মরণ, উভয়ই ত সত্য।”

নীরদ উৎসাহে বলিল, “কোনটা সত্য, তা হ’লে তো কার্য্য-দ্বারাই বোঝ্‌তে হ’বে? কার্য্যদ্বারা জীবন-মরণ, উভয়ই সত্য হ’তে পারে। আচ্ছা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য তবে কি, বীণে?—পরের জন্য প্রাণ দেয়াটাকে ত একটা খুব বড় সৎকর্ম্ম বল্‌বে?”

বীণা বুদ্ধিমতী। সে বুঝিল, প্রাণ-পণ চেষ্টায়ও রোগীকে বাঁচাইতে না পারায় আজ জীবনের প্রতি স্বামীর ধিক্কার জন্মিয়াছে

তাই স্বামীর মুখে এমন বেদনাভরা প্রশ্ন। সে ধীরকণ্ঠে বলিল, "মানুষের কাজ ত অনেক রকম, সে জীবনে যতই অগ্রসর হয়, ততই তার কাজের সংখ্যা বাড়্‌তে থাকে। যে জীবনে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রাপ্তি ঘটে, সে জীবন ত সামান্য নয়; তার কর্ত্তব্যের কথা আমি তোমায় কত বল্‌বো? আর আমি তার জানিই বা কি? কিন্তু তোমার জ্বর বেড়ে যাচ্ছে, এখন আর কথা না বলাই সঙ্গত।"

"না বীণে! এ সামান্য জ্বরে আমার মরণ হ'বে না। আমি বল্‌ছি, পরোপকারই মানুষের প্রধান সৎকর্ম্ম; তাতেই জীবনের সকল শুভ উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে। পরোপকারের জন্য মরণেই চির-অমরতা লাভ হয়ে থাকে।"

বীণা এবার স্বামীর কথার কোন উত্তরই দিল না; 'আমার মরণ হ'বে না',—স্বামীর মুখে এই অশুভ কথা শুনিয়াই সে মুখ ফিরাইয়াছিল। এখন সে নতমুখে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। গৃহ-দেবতা মা-সর্ব্বমঙ্গলার পদে প্রণতি জানাইয়া বীণা মনে মনে প্রার্থনা করিল, "মা-সর্ব্বমঙ্গলে! স্বামীকে সত্বর সুস্থ করো, যোড় পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজা কর্‌বো। জ্বরে পড়ায় ওঁর মাথা আর কিছু ঠিক নেই,—যা তা বক্‌ছেন। মা, তুমি সে কথায় কাণ দিয়ো না,—আমার একমাত্র আশ্রয় ভেঙ্গে ফেলো না।"

১৭

নীরদ সারিয়া উঠিতে এক পক্ষেরও অধিক সময় লাগিল। তাহাকে দেখিতে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই আসিল। আসিবে না কেন,—সে সে-অঞ্চলের সকলের হৃদয়ের রাজা;—তাহার রোগে সকলেই দুঃখিত। তাহাকে দেখিতে ভুবনও একদিন বৈকালে সস্ত্রীক আসিল।

ভুবন না হয়, মনের টানেই তাহার বাল্য-বন্ধুকে দেখা প্রয়োজন বোধ করিল; কিন্তু তাহার স্ত্রী মনোরমা কেন তাহাকে দেখিতে আসিল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। কেশববাবু তাহার একমাত্র সন্তান মনোরমাকে নিজেই যতদূর সম্ভব, লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তৎপর আরও বেশী শিখাইবার জন্য তাহার মাতুলের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় রাখিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন ঢাকার নবাব-ষ্টেটের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী, খুব বিজ্ঞ আর বিদ্যোৎসাহী। তিনি মনোরমাকে অতিশয় স্নেহ-যত্ন করিতেন এবং আপনার বড় মেয়েটীর সঙ্গে তাহাকে ঢাকার ইডেন হাইস্কুলে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি অবসর পাইলেই মেয়ে দুটীকে লইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন; তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশদানে উন্নত করিতেও চেষ্টা করিতেন। তিনি হিন্দু হইলেও তাঁহার গোঁড়ামি ছিল না,—সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা

করিতেন, এবং নানা দেব-দেবীর পূজাকে পৌত্তলিকতা বলিতে সময় সময় উৎসাহ দেখাইতেন। তিনি প্রায় প্রতি রবিবারেই মেয়ে-দুটীকে লইয়া ঢাকার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং ঘরে ফিরিয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-নীতিটা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য নিজেও ছোট-খাট বক্তৃতা করিতেন। মনোরমা হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষা দেয় নাই; এক ক্লাস নীচে থাকিতেই বিবাহের বয়স হইয়াছে বলিয়া কেশববাবু তাহাকে দেশে লইয়া যান এবং যথাকালে ভুবনের করে তাহাকে সমর্পণ করেন।

মনোরমা স্বামী-গৃহে যাইবার তিনমাস তিনদিন পরেই ভুবনের মাতা হঠাৎ হৃদ্‌-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তারপর মনোরমাই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইল এবং নিজের হাতে কাজ না করিলেও দাস-দাসীকে আদেশ দিয়া কাজ করাইয়া সুচারুরূপে সংসার চালাইতে লাগিল। মৃত্যুকালে কালীমোহন বাবু যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন; ভুবন লগ্নী করিয়া তাহা আরও বাড়াইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তাহার আয় বৃদ্ধি হইতে চলিল। মনোরমাকে ঘরে আনিবার দেড় মাস পরেই সে একখানা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল এবং কেবল মহাজনীতে টাকা না খাটাইয়া কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজও কিনিল। "স্ত্রীর ভাগ্যে ধন"—এই চলিত কথাটার উপর ভুবনের যথেষ্ট আস্থা ছিল। বিদুষী গৃহ-লক্ষ্মী কোনরূপে অসন্তুষ্ট হইলে পাছে তাহার বৈষয়িক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, মনে মনে সর্ব্বদা সে শঙ্কাও করিত এবং সে-জন্যই মনোরমা স্বীয় বসন-

ভূষণে সময় সময় কিছু অত্যধিক ব্যয় করিলেও সে পত্নীকে বারণ করিয়া মনের শাদা সত্য ভাবটা প্রকাশ করিতে ভরসা পাইত না। মনোরমার চিত্ত বাস্তবিকই উদার ও কোমল ছিল। ঢাকায় থাকিতে সে যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহার ফল ব্যর্থ হয় নাই, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বরং তাহাতে অধিক উৎসাহ হইয়াছিল এবং পুস্তকপাঠের ফলে তাহার জ্ঞান আরও বাড়িয়াছিল। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সে দেশের অবস্থার খোঁজ-খবর করিয়াছিল এবং মেয়ে-মানুষ হইলেও দেশের কোনও কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবার সুযোগ ঘটে কিনা, অনুসন্ধান লইয়াছিল। শিক্ষিত ও ধনী স্বামীর গৃহিনী হওয়ায় প্রথমতঃ সে মনে মনে উল্লসিত হইয়াছিল ; কারণ স্ব-সঙ্কল্প সাধনের জন্য এরূপ স্বামীর সঙ্গিনী হওয়াই সে প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। কথা-বার্ত্তায় সর্ব্বদা সে নীরদের খুব প্রশংসা করিত এবং নীরদ যে সে-অঞ্চলে একজন মানুষের মত মানুষ, তাহা যখন-তখন স্বামীকে বুঝাইয়া দিতে চাহিত।

কিন্তু স্বামীর বন্ধুর গুণগ্রাহিনী হইয়া তাহাকে পীড়ার সময়ে দেখিতে যাওয়া মনোরমার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। ইহা মুখ্য হইয়াও গৌণ,—এ কারণে কোন পল্লী-কুলবধূ ভিন্ন গ্রামের স্বামী-বন্ধুকে দেখিতে যাইবার অনুমতি পায় না। যে কারণটা গৌণ হইয়াও মুখ্য বলিয়া দাঁড়াইল, এবং যে-যুক্তির বলে ভুবন পত্নীর অভিলাষ পূরণ করিতে সম্মত হইল, এখন তাহার কথাই বলা যাইতেছে। পূবেরগাঁও স্কুলের ছাত্রদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের সভায় সভাপতির কার্য্য করিতে ডাক্তার কেশব বাবুকে একবার

বিশ্বাসদের বাড়ীতে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তখন কেশববাবু আদরের মেয়ে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মনোরমা ও বীণাপাণি সমবয়সের না হইলেও প্রায় ঐরূপই দেখাইত। কারণ মনোরমার শরীরটা কিছু খাট ও ক্ষীণ ছিল; কিন্তু সেই ছিল প্রায় পাঁচবছরের বড়। তথাপি দেখা হইবামাত্র উভয়ের মনোমিলন হইয়াছিল এবং একে অন্যকে 'সই' বলিয়া ডাকিয়াছিল, ঘণ্টাখানেকের মিলন হইলেও এ মিলনটা বড়ই আন্তরিক হইয়াছিল; তাই এতকাল পরেও তাহা মনোরমার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আজ মনোরমা সেই শৈশব সখিত্বের যুক্তিটাকেই দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল এবং ভুবনের সাধ্য হইল না যে, সে দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করিয়া মনোরমাকে ফেলিয়া যায়। সুতরাং সেও স্বামীর সখাকে না হউক, অন্ততঃ আপন সখীকে দেখিবার জন্য স্বামীর সঙ্গিনী হইল।

ভুবনকে কাছে আসিতে দেখিয়াই নীরদ উৎসাহে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, যেন রোগের অবসাদ আধা-আধি কমিয়া গিয়া শরীরে নববলের সঞ্চার হইল! ভুবনকে কাছে বসিতে বলিয়াই নীরদ পান আনিতে বীণাকে ডাকিল। কিন্তু বীণা তখন-তখনি আসিল না, প্রায় দশমিনিট পরে অবগুণ্ঠনে মুখখানি সুন্দররূপে আবৃত করিয়া অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনবতী মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। মনোরমাকে দেখিয়া নীরদের শরীরটা পুরাপুরিই যেন সুস্থ হইল; সে হাসিমুখে বলিল, "পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনি বন্ধু-দর্শন করালেন।"

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল, "সৌভাগ্যটা দুপক্ষেরই সমান ; আজ আপনিও আমায় সখী-দর্শন করালেন।"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া নীরদ বিস্ময়ে ভুবনের মুখের দিকে চাহিল। ভুবন কিছু না বলিতেই মনোরমা আবার হাসিয়া বলিল, "বীণু যে আমার 'সই,' তা বুঝি আপনি এখনো জানেন না? ভাই-বীণু, তুমি তা নীরদবাবুকে কখনও বল নি বুঝি?"

আজ প্রয়োজন পড়িয়াছে বলিয়াই মনোরমা স্বামীর নিকট বাল্য-সখ্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। বীণা কখনও দরকার বোধ করে নাই, তাই তাহা বলেও নাই। বাল্যের সে সুখ-স্বপ্নটা যে কালে এমন করিয়াই কাজের হইয়া পড়িবে, তাহাও সে কোন দিন ভাবে নাই। সে শুধু মাথা নাড়িয়া 'না' জানাইল।

বীণা স্বামীর কাছে শুনিয়াছে, ভুবন তাহার স্বামীর বন্ধু ; কিন্তু সে কখনও ভুবনকে চাক্ষুষ দেখে নাই। সে সখীর স্বামী হইলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-চরিত্র বলিয়া তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে ঘোমটা তুলিয়া কথা-বার্ত্তা বলিবার মতন চরিত্র বীণার নয় ; সে শিক্ষাও সে কোনদিন পায় নাই। কাজেই মাথা নাড়িয়া 'না' করা ছাড়া তাহার আর কিছু করিবারও ছিল না। কিন্তু সখীর এহেন লজ্জা-জড়-সড় ব্যবহারটা মনোরমার চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল ; সে একটু কৌতুক করিবার জন্য হাসিয়া বলিল, "নীরদবাবু, আমার একটা মস্ত বড় অভিযোগ আছে,—শোন্‌বেন?"

"বলুন না, আপনার অভিযোগটা কি ;" বলিয়া নীরদও হাসিল।

মনোরমা স্মিতমুখে বলিল, "আপনার বন্ধু নাকি বন্ধু-পত্নীকে কোন দিনই ভালো করে দেখেন নি, তাই আজ সে সাধ মেটাবার জন্য আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।"

"ছি!—ও কি কথা!" বলিয়া ভুবন মনোরমার দিকে বক্র-দৃষ্টিতে চাহিল, আর নীরদ হো-হো করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল।

মনোরমা তথাপি দমিল না, প্রফুল্ল ভাবেই বলিল, "আপনার অনুমতি হ'লে আমাদের শুভ অভিযানটা সফল হ'তে পারে।"

নীরদেরও দেলখোস ভাব; সে হাসিয়া বলিল, "আমার অনুমতি যেন র'ল; কিন্তু আপনার সইয়ের সম্মতি ত চাই। না, সন্ধি না হ'লে অস্ত্র-প্রয়োগে উদ্দেশ্য সাধন করা হ'বে?" ইহা বলিয়াই সে প্রণয়-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে বীণার দিকে চাহিল। বীণা কিন্তু তাহার লজ্জারুণ মুখ-মণ্ডল তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠনে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া ফেলিল।

"সন্ধি না হ'লে অস্ত্র-প্রয়োগ ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু..." বলিয়াই মনোরমা ফিরিয়া দেখিল, তাহার লজ্জাশীলা সখী কক্ষান্তরে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং পলায়মান বিপক্ষের অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই দেখিয়া মনোরমাও সে কক্ষের দিকে গমন করিল।

নীরদ বলিল, "আমার জ্বর এখন হয় না, ভাই! কিন্তু শরীরটা বড্ড দুর্ব্বল। ডেঙ্গু-জ্বরে হাত-পা ভেঙ্গে যেন একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে!"

"ডেঙ্গু বড় পাজি জ্বর; ভোগ তার মাত্র তিনদিন, কিন্তু জের সারতে লাগে বিশ-বাইশ দিন।" বলিয়াই একটু থামিয়া ভুবন

আবার বলিল, "আচ্ছা, ভাই! সমিতির কাজগুলো এখন চল্‌ছে কেমন ?"

নীরদ আগ্রহ-ভরা-কণ্ঠে বলিল,"যুবক-সমিতির কথা বল্‌ছো ত ? আজ আটদশ দিন যাবত ত আমি তার বিশেষ কোনো খোঁজ-খবর করি নি। তবে মোটামুটি বল্‌তে পারি, অর্থাভাবে সব কাজ অচল হয়ে পড়ে রয়েছে ; দুর্দ্দিন বলে অনেক পরিবারেই মুষ্টি-চাউলও রাখ্‌ছে না। আবার এককালীন চাঁদা কিছু আদায় কর্‌তে না পার্‌লে নির্দ্দিষ্ট চাঁদাদ্বারা কোনো কাজই ভালো চল্‌বে না। কিন্তু চাঁদা এ অঞ্চলে আর যে মিল্‌বে, তারো ভরসা নেই।"

"তা এককালীন চাঁদা আদায় না হোক্, মাসিক চাঁদা আরো বেশী আদায় হ'তে পারে। আমার মতে সমিতির সভ্য-সংখ্যা আরো বাড়ান উচিত। আমিও এখন থেকে আবার সভ্য হবো, মাসে মাসে চাঁদাও দেবো।" ইহা বলিয়াই ভুবন অপর কক্ষের দরজার দিকে চাহিল।

নীরদের সদা-প্রফুল্ল মুখখানি উৎসাহে আরও প্রফুল্ল হইল, বলিল, "তা করো ভাই, সবে মিলে একযোগে কাজ করে দেশটাকে তোলো ;—'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' সকলকে নিয়ে মিলে-মিশে কাজ কর্‌তে পার্‌লে, কত যে বল পাই, তা বল্‌বার নয়, ভাই!"

মনোরমা কক্ষান্তরে সখীর সহিত নানা বিশ্রম্ভ-আলাপে নিযুক্ত থাকিলেও স্বামী ও তাঁহার সখার দেশ-হিতকর কাজের আলোচনায় তাহার কাণ ছিল। সে উঠিয়া আসিয়া নীরদকে সহাস্যবদনে

বলিল, "আপনার বন্ধু ত সভ্য হবার প্রতিশ্রুতি জানালেন। আবার হয়ত সর্ত্ত-পালনের শঙ্কায় কোনদিন ইস্তিফা-পত্র পাঠাবেন। কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর্‌তে পারেন, আমি সুযোগ-সুবিধা পেলেও কখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর্‌বো না।"

নীরদ সুযোগ পাইয়া একটু রসিকতা করিতে ছাড়িল না, বলিল, "তা হ'লে আপনিও সমিতির সভ্য হলেন না কি?" ইহা বলিয়াই সে উচ্চহাস্যে কক্ষটা প্লাবিত করিয়া দিল।

মনোরমা বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "বাঃ!—মেয়েদের কি সমিতির সভ্য হবার অধিকার-টধিকার নেই না-কি?"

নীরদ পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "তা থাক্‌বে না কেন; কিন্তু এ সমিতি যে যুবকদের, যুবতীদের নয়!"

"তা হোক্ গে, আপনারা না হয়, নাম পরিবর্ত্তন করুন্; আমি আর সই সমিতির সভ্য হলাম্।" ইহা বলিয়াই মনোরমা সে কক্ষে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু গেল না,—কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল; পরে নীরদকে প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা, নীরদবাবু, এককালীন চাঁদার কথা বোল্‌ছিলেন,—না? ওটা কি হারে আপনারা ওঠায়ে থাকেন?"

নীরদের হৃদয়ের দ্বার আজ উন্মুক্ত; সে একটু বিদ্রূপের ছলে বলিল, "ধনীদের কাছে কিছু কম করেই চাওয়া হয়; কারণ তাঁরা বড্ড হিসেবী, অনেক হিসাব-কিতাব করে তবে খরচ করেন। কাজেই হাতে বেশী ওঠে না। তাঁদের কাছে দু-শ, আড়াই-শ করে চাওয়া হয়, কিন্তু পাওয়া যায় তার চেয়ে ঢের কম। আর আমাদের

মত গরীবেরা দেয় ঠিক দু'শ, আড়াই শ করেই।" বলিয়াই সে মুখের হাসি চাপিতে লাগিল।

"তা ধনীরা অনুগ্রহ করে যা দেন, তা-ই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নেয়া আপনাদের উচিত। ধনীরা কিছু না দিতে চেলেও প্রশংসা কর্‌তে হয়; কারণ তাঁরা হিসেব করেই ত দিতে নারাজ হয়। ধনীদের নিন্দে করে আর কি হবে? তাদের আয় যেমন বেশী, খরচও ত তেম্‌নি বেশী।" বলিয়াই মনোরমা আড়চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

"ধনীদের মরণ আর কি!" বলিয়াই ভুবন একটু কাষ্ঠহাসি হাসিল; তারপর আবার বলিল, "আচ্ছা, নীরদ-দা, আজ তবে বিদায় হচ্ছি, বেলা যে পড়ে আস্‌লো। তুমি ভালো করে সুস্থ হও, আর একদিন এসে কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে।"

"তোমার যে এখনো পান খাওয়া হয় নি।" বলিয়াই মনোরমা পান দিতে বীণাকে ডাকিল। সে ঘোমটা টানিয়া আসিল এবং পানের ডিবাটী দিয়াই চলিয়া গেল। ভুবন তাড়াতাড়ি দু' তিনটী পানের খিলি একত্র মুখে গুজিয়া দিয়াই মনোরমাকে বলিল, "তোমার সয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছ ত? আর যে বিলম্ব করা চলে না,—বাইরে বেহারা দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"সই বল্‌ছে, সমিতির জন্য পাঁচশ টাকা না দিলে বিদায় দেবে না। এখন কি করা যায়, বল দিকিনি?" বলিয়াই মনোরমা গাল টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভুবন বিষম বিরক্তির স্বরে বলিল, "তুমি নেহাত বাচাল!—সব তাতেই তোমার পাগলামি! এ বাড়ীতে আজ আস্‌লে নতুন; এসেই যত সব ছিবলেমো কাণ্ড!—এ কি রকম!"

"কেন, রকমটা কিছু নতুন ঠেক্‌ছে? তা সয়ের পাল্লায় পড়্‌লে পাগলই যে হতে হয়! তুমিও ত বন্ধুর পাল্লায় পোড়ে মেম্বার হতে স্বীকৃত হ'লে; ওটা কি রকম, জিজ্ঞেস্ কর্‌তে ত পারি?" বলিয়াই মনোরমা মুখের হাসি চাপিতে চাপিতে অপর কক্ষে যাইতেছিল। তাহাকে, পক্ষান্তরে তাহার সইকেও—জব্দ করিবার জন্য ভুবন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত দিবে বল্‌ছ, পাঁচশ; তোমার সই দিবেন কত, শুনি,—আটশ নাকি?"

মনোরমার পক্ষে এ কথার উত্তর দেওয়া কিছুই কঠিন ঠেকিল না। সে তখন-তখনি সহাস্যমুখে বলিল, "আমি ধনীর গৃহিণী কিনা, তাই আমি দিব মাত্র একশ; আর সই দিবে তিনশ;—সই যে কর্ম্মিপত্নী! এই চারশতেই এখন চল্‌বে; একশ তোমার কাছে আপাততঃ থাক্‌বে।"

১৮

ভুবন ও মনোরমা বিদায় হইয়া গেলে নীরদ পত্নীকে বলিল, "দেখ্‌লে বীণে, তোমার সইয়ের চরিত্রটা কত মহৎ! তার মনটা যেমন জ্যোছ্‌নার মতন শাদা, প্রাণটাও তেমনি হাওয়ার মতন খোলা!—ভারি চমৎকার মেয়ে!"

তরুণীরা প্রায়ই অন্য মেয়ের প্রশংসা সহিতে পারে না, আপনার জনেরও না। বীণা মুখ ভারী করিয়া বলিল, "আমি বল্‌ছি, ভুবন বাবুর গাম্ভীর্য্যটা তার চেয়েও মহৎ। সয়ের ভেতরে মহত্ত্ব বলে কিছু থাক্‌লেও তার ছিবলেমো বুদ্ধি তা ছাপায়ে উঠেছে! কবেকার দু'দশ মিনিটের 'সই' ডাকা; সে মেয়েলী খেয়ালটার ওপর ভর করে লজ্জার মাথা খেয়ে পর-পুরুষের সঙ্গে এম্‌নিভাবে কি কোনো মেয়ে-মানুষে আলাপ কর্‌তে পারে? আমি ত এ ভাব্‌তেই পারি নে!"

বীণা ভুবনের গাম্ভীর্য্যের কেন প্রশংসা করিল, তাহা নীরদ অনায়াসে বুঝিল। কিন্তু তথাপি সে নিজের সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া মনোরমার সম্বন্ধে শুধু বলিল, "ওটাকে ঠিক ছিবলেমো বুদ্ধি বলা চলে না, বীণে; ওটা ওঁর প্রকৃতি। যাঁরা কাজের লোক, তাঁরা কাজের বেলা লজ্জা রাখেন না; এতে নিন্দে কর্‌বার্ কিছুই নেই। সব সময় গাম্ভীর্য্য কিছু শোভনও হয় না। লজ্জাই বল,

আর গাম্ভীর্য্যই বল, কাজের সময় ওসবের দিকে মন দেয়া যায় না। আর জেনো, ডাকাডাকিটা তেমন বেশী কিছু নয়, আন্তরিকতাই হচ্ছে মূল। প্রেমিকের অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রেমের ঝর্ণা গোপন থাকে, তা এক পলকেই ছুটে বের হতে পারে,—যদি প্রেমের পাত্র তাকে প্রাণের সহিত আকর্ষণ করে!"

প্রেমের ব্যাখ্যাটা বীণার কাছে আজ মোটেই ভাল লাগিল না, বরং তাহাতে তাহার ক্ষুব্ধ চিত্ত অধিক আকুল হইয়া পড়িল। সে বলিল, "লজ্জাই ত মেয়েদের অলঙ্কার; লজ্জা ত্যাগ কর্‌লে আর বাকী থাকে কি? আমি কাজের লোক না হতে পারি, কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে এম্‌নি ভাবে অজানা কোনো পুরুষের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য কর্‌তে কখনি পারি নে, কোনদিন বোধ হয় পার্‌বও না।" ইহা বলিয়াই বীণা ঘৃণায় নাশিকা কুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সরলা বীণার রাগে নীরদ মনে মনে খুব হাসিল বটে, কিন্তু বাহিরে সে-ভাব প্রকাশ করতে ভরসা হইল না। কারণ তাহাতে সে অধিক রুষ্ট হইয়া আরও অপ্রিয় কিছু বলিতে পারে, কিম্বা মান করিয়া একটা অকাণ্ডও ঘটাইতে পারে। বীণা কতখানি অভিমানিনী, তাহা পূর্ব্বের দু'একটী ঘটনায় নীরদ ভালরূপে জানিয়াছে। তাই বীণাকে শান্ত করিবার জন্য সে বলিল, "তা পার্‌বে না—সত্য, এটাই তোমার প্রকৃতি। তুমি যে কাজের লোক নও, তা ত আমি বল্‌ছিনে, বীণে। বরং তুমি যে কাজে নিপুণা, সে কাজে লজ্জাই তোমার সঙ্গিনী হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের কর্ত্তব্য ত বহু, কর্ম্মক্ষেত্রও সুবিস্তৃত। যে যে-ভাবে সুবিধে পাচ্ছে, সে সে-ভাবেই কাজ

করছে। তোমার সই যে-ভাবে কাজ করতে যাচ্ছেন, তাতে অপরিমিত লজ্জা রাখ্‌লে চল্‌বে না, ওটাকে সঙ্কোচ কর্‌তেই হবে।"

নীরদ যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিল; মনোরমার প্রশংসায় বীণা যেন অকস্মাৎ তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল; বলিল, "বুঝেছি, সে রূপসী তোমার সঙ্গিনী হয়ে কাজ কর্‌তে চাচ্ছে বলেই তুমি তার প্রতি অমন অনুরক্ত, তার নির্লজ্জতায়ও তোমার এমন আমোদ! দেশের কোনো কাজ কর্‌তে হবে বলে তুমি কোনো দিনই ত আমায় উপদেশ দেওনি, বরং ও সব বিষয়ে মন দিতে বারণ করেছ। তবে কি..."

সন্ত্রস্ত-চিত্ত নীরদ বীণাকে থামাইয়া দিতে বলিল, "শুন বীণে! কেন তোমায় বারণ করেছি। তুমি মেয়েদের তরফ থেকে একা দেশের কাজে নেমে বেশী কিছু কর্‌তে পার্‌বে না বলেই আমি তাতে মত দিই নি। আমাদের সমাজের মেয়েরা তেমন শিক্ষা পায় নি, তেমন অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করে নি,—যাতে দেশের কাজে নাম্‌তে পারে। তোমার সই এ সমাজের মেয়ে হলেও তিনি শিক্ষা পেয়েছেন ঢাকার এক উন্নত পরিবারে। তাই তাঁর চোখ ফুটেছে, দেশের অবস্থা বুঝেছে, আর দেশের প্রতি প্রীতিও মনে জেগেছে। তারপর তুমি ওসব বিষয়ে মন দিলে আমার গৃহ-কর্ম্ম চল্‌বে না বলেও বারণ করেছি। এক জনকে ত ঘর দেখ্‌তে হ'বে; বিশেষতঃ বুড়ো মা ঘরে আছেন, তাঁর সেবা-যত্ন কর্‌তে হবে। আমার বিশ্বাস, দেশের কাজের চেয়ে এসব কাজেই তোমার বেশী অনুরাগ;—নয় কি?"

"এ সব কাজ করেও ত বিস্তর সময় থাকে—অন্য কাজের জন্য। সই যখন ওসব কাজে অভিজ্ঞ, তখন আমি না হয় তার কাছেই যা শিখ্‌বার শিখে নেব। আচ্ছা, ঠাকুর-পোর সম্বন্ধটার কি হ'ল? ওঁকে কি এখন বে' করাবে না? বয়েসও ত আর কম হয় নি। মা আর ক'দিন আছেন। তাঁর সাধটা ত সিদ্ধ হতে দেয়া উচিত।" বলিয়া বীণা উত্তরের অপেক্ষায় উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

নীরদ হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি এখনি নিষ্কৃতি চাও নাকি? অনেক স্থান হতেই ত প্রস্তাব আস্‌ছে; এখন বিয়ে করান কঠিন কিছুই নয়। কিন্তু উপার্জ্জনের একটা পথ না করে বিয়ে করান হবেনা; ওটা আমাদের হিতসাধিনী-সভার মতের অনুকূল নয়। আস্‌ছে মাসেই অনিলকে দিয়ে সুবাসগঞ্জের বাজারে একটা কারবার দেয়াব, ঠিক করেছি। সেটা আরম্ভ হলেই বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করা হ'বে। মাকে একথাটা একটু বুঝিয়ে বলো।"

"বীণা এ কথায় বড়ই প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা বল্‌বো। ঠাকুর-পোর বে হলে, কিন্তু তখন আর আমায় দেশের কাজে নাম্‌তে ঠেকায়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"ঠেকাবো কেন? দেশের কাজে যদি তুমি নেমে পড়ো, তবে সকলের চেয়ে ভালো করেই তা কর্‌তে পার্‌বে, জানি।"—বলিয়া নীরদ স্নিগ্ধ-মধুর দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিল।

"বীণা কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিল,—সয়ের চেয়ে আর ভালো করে পার্‌বো না; কি বলো?"

"কাজে মন দিলে তাঁর চেয়েও ভালো করে যে তুমি পার্‌বে, তা' অসম্ভব কিছুই নয়।"

"কেন তুমি এমন মনে কর্‌ছ, বল দিকিনি? আমি ত দেশের কাজের কিছুই জানি নে,—একেবারে আনাড়ি।" এ কয়টী কথা বীণার ঝঙ্কারের মত মধুর নিক্কণে বীণা ধীরে ধীরে বলিল।

"মন থাক্‌লে কাজ শিখ্‌তে অনেক দিন লাগে না, বীণে; তোমারও লাগ্‌বে না। তোমার সয়ের কাজে মন থাক্‌লেও নিজের হাতে কর্‌বার মত ধীরতা-সহিষ্ণুতা নেই। আর নিজের হাতে না কর্‌তে পার্‌লে দেশের কোনো কাজে সাফল্য লাভের আশা কম।" ইহা বলিয়া নীরদ পত্নীর দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিল।

বীণা দেখিল, সখীর প্রতি স্বামীর অনুরাগ তেমন গভীর নয়; সুতরাং স্বামীকে পূর্ব্বে যে অনুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। এখন স্বামী তাহারই গুণের পক্ষপাতী হইয়া প্রশংসা করিতে যাইতেছেন দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং সন্ধ্যা-আরতির কাজ করিতে হইবে বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

ইহার তিন দিন পরে নীরদ অপরাহ্নে বাহিরের আঙ্গিনায় পাইচারী করিতেছিল; হঠাৎ ভুবন সম্মুখে দেখা দিল এবং দুই হাত মাথায় তুলিয়া খুব বড় একটী নমস্কার করিয়া বন্ধুর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। নীরদ সহাস্যবদনে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া, বৈঠকখানার দিকে লইয়া গেল এবং যাইতে যাইতে বলিল, "আজ তিন দিন যাবত বেশ ভালো আছি; এখন আর জ্বর হচ্ছে না। আজ

শরীরটা খুব হাল্‌কা বোধ হচ্ছে, তাই বার হয়েছি। তোমরা সবে ভালো আছো ত ?”

“হাঁ ভাই, ভালোই। একটা বিশেষ জরুরী বিষয়ের পরামর্শ কর্‌তে আজ তোমার কাছে এসেছি। তা তবে বল্‌বো এখন ?” বলিয়া ভুবন উত্তরের আশায় নীরদের মুখের দিকে সোৎসাহে তাকাইল।

নীরদ বলিল, “বলনা শুনি,—কোন বিষয়ের পরামর্শ ?”

“আমাদের স্কুলের বিষয়। এখুনি বল্‌ছি তবে। মাত্র নীচের কয় শ্রেণীর ছাত্রগণ এখন শিল্প তৈরী কর্‌ছে। ওপরের শ্রেণী গুলোতেও শিল্প শেখান উচিত।”

“উচিত ত বটেই, ভাই ; কিন্তু করায় কে ? করাতে পার্‌লে স্কুলের দু’পয়সা আয় হয়, ছেলেদেরও উপকার হয়। বলায়ের নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশটী নেই, তাকে নতুন কিছু কর্‌তে আর বলা যায় না।”

“তা বলাই না করুক, তত্ত্বাবধানের জন্য লোকের কখ্‌নি অভাব হবেনা।”—কথাটা ভুবন খুব জোর দিয়াই বলিল, তাহাতে নীরদ ভরসা পাইয়া বলিল, “সত্যি ? তুমি তত্ত্বাবধান কর্‌বে ত ?”

“তা না কর্‌লে চল্‌বে কেন ? স্কুলটা ত আমাদের সকলেরি, নীরদ-দা।”

“যদি তাই হয়, তবে শুধু শিল্প নয়, উচ্চ শ্রেণীতে আরো নানা বিষয় শেখাবার রয়েছে, যা ছেলেদের শেষে স্বাবলম্বী করে তোল্‌বে। নিম্ন শ্রেণীতেও আরো কিছু শেখাতে হবে ; শুধু

বাঁশ-বেত-কাঠ-মাটি দিয়ে কিছু কিছু কাজ শিখ্‌লেই যথেষ্ট হয় না।"

ভুবন আগ্রহের ছলে বলিল, "কোন্ শ্রেণীতে কি শেখাতে চাও, বলোনা—শুনি।"

"আমি এখুনি সব ঠিক করে ফেলি নি, মতলব করেছি মাত্র। সব শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা করে তবে ঠিক কর্‌বো। শিশু-শ্রেণীতে কাগজ কাটার সঙ্গে সঙ্গে চরকায় সূতা কাটাও শেখান হবে। তার উপরের শ্রেণীতে বাঁশ-বেতের কাজটা ভালো করেই চল্‌বে, তার সঙ্গে মাটির জিনিষ তৈরীর কাজ ও কাপড় কাটার কাজ কিছু কিছু শেখান হবে। তার উপরের শ্রেণীতে মাটির কাজটায় আরো জোর দিতে হবে; আর মিস্ত্রির কাজ শেখান হবে, দরজীর কাজও চল্‌বে। তার উপরের শ্রেণীতে কাঠের জিনিষ তৈরীর কাজ আর দরজীর কাজ ভালো করে শেখায়ে সাবান, সতরঞ্চি, মাহুর, বুরুশ প্রভৃতি তৈরীর কাজ শেখান যেতে পারে আর বয়নের কাজও কিছু কিছু শেখান হবে। তার ওপরে বয়নের কাজটা ভালো করে শেখায়ে তাঁত-নির্ম্মাণের কাজ শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সূতায় ও কাপড়ে রং কর্‌তেও শেখান হবে। তার ওপরে প্রেসের কাজ এবং চিকিৎসা-বিদ্যা—অর্থাৎ কবিরাজী কি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-প্রণালী—শেখান যেতে পারে। তার ওপরে কলের সাহায্যে মোজা-গেঞ্জি বোনা শিখায়ে সর্ট-হ্যাণ্ড, টাইপ্-রাইটিং, বুক্-কিপিং প্রভৃতি বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তার ওপরে কল কারখানার কাজ, ইলেক্ট্রিকেল

ইন্‌জিনিয়ারিং প্রভৃতি কত শেখাবার বিষয় রয়েছে। কিন্তু আমাদের অত অর্থ কোথায় যে, সব গুলোর ব্যবস্থা এককালে হ'তে পারে? দেশের ধনীরা যদি এ সব বিষয়ে মন দেন, তবেই ক্রমে ক্রমে বন্দোবস্ত কর্‌বার চেষ্টা চল্‌তে পারে।"

"তোমার কল্পনা-শক্তিকে বড্ড ধন্যবাদ দিতে হয় নীরদ-দা! তুমি যে-যে শিক্ষণীয় বিষয় সুস্থির করে রেখেছ, তা ভাব্‌তে হলে বিলাতের বড় বড় পণ্ডিতদেরও অনেক দিন মাথা ঘামাতে হবে!"

ভুবনের মুখে আপনার প্রশংসার কথা শুনিয়া নীরদ যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনি বিস্মিত হইল। বন্ধুর মুখে আপনার স্তুতি-বর্ণনকে নিজের জয়ঢাক নিজে পিটানের মত নিতান্ত তুচ্ছই মনে করিতে লাগিল। এই স্তুতির বাদ্যটা ভুবন খুব গম্ভীর ভাবে বাজাইলেও উহাকে হাল্‌কা করিয়া তুলিবার জন্য নীরদ ব্যঙ্গভরে বলিল, "বিলাতের বড় বড় পণ্ডিতদের মাথা ঘামাতে হবে বলে এদেশের অসভ্য মূর্খদের মধ্যে কেহই যে ও বিষয়টায় হাত দিতে পার্‌বে না, তেমন কোনো কথা আছে কি? বিলাতের মাথাগুলো ননীর তৈরী কিনা, তাই একটু তাপ পেলেই ঘামে; আর এদেশের মাথাগুলো যে রোদে শুকায়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দিন-দিন ঝুনো হচ্ছে, তাই সহজে ঘাম্‌ছে না। তুমি ভাই, বিলাতী পণ্ডিতদের অমন ভক্ত হলে কবে থেকে? তাঁরা প্রশংসার যোগ্য বটে! কিন্তু তোমার অযোগ্য বন্ধুর প্রশংসায় যে তুমি অমন উন্মুখ হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি;—আশ্চর্য্যের কথা আর কি!"

"না ভাই, সত্যের মর্য্যাদা রাখ্‌তে গেলে আমাকে এ বল্‌তেই হবে যে, তুমিই আমাদের দেশের মাথা, স্কুলেরও সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার গিন্নীও আমায় সর্ব্বদা সে কথা বলে থাকে। যাক্‌, প্রিয়তম বন্ধুকে প্রশংসার কথা বেশী করে না শোনালেও ক্ষতি নেই। আমি যেজন্য এসেছি, এখন সেকথাই তবে বল্‌ছি। মনোরমার ইচ্ছে, আমি যেন তোমায় সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে তোমার উদ্দেশ্যগুলি সফল করে তুলি। তার প্রাণের কথাগুলো শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি এবং স্কুলের কাজের তত্ত্বাবধান কর্‌তেও উৎসাহী হয়েছি। আর তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি সুবাসগঞ্জের বাজারে একটা কারবার খোল্‌তে ইচ্ছে করেছি। টাকাটা তার বাবার; বিয়ের কালে দিয়েছিলেন। জানো ত, আমি পণ নিব না বলায় তিনি আগ্রহের সহিত এ টাকাগুলো কারবারের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। মনোরমা বল্‌ছে, এ কারবারে যে লাভ হবে, তার একটা মোটা অংশ স্কুলের জন্য দান কর্‌বে। তার হৃদয়টা কত উচ্চ, একবার ভেবে দেখো নীরদ-দা।"

নীরদ হাসিয়া বলিল, "তোমার পত্নীর প্রশংসার ঢাকটাও এত জোরে না পেটালে চল্‌বে; তাঁর গুণের কথা সবই ত আমি জানি। তুমি যে কারবারের কথা বল্‌ছো, তা ত খুব ভাল বিষয়, ভাই। তোমার অর্থের অভাব নেই; উপযুক্তরূপে মূলধন খাটায়ে যে ব্যবসায়ে হাত দেবে, তাতেই বিস্তর লাভ কর্‌তে পার্‌বে। দেড় হাজার টাকায় আর কি ভালো কারবার চল্‌বে? আরো বেশী টাকা খাটালে,..."

নীরদকে বলিতে বাধা দিয়া ভুবন বলিল, "না—না, এখুনি বেশী মূলধন খাটায়ে ব্যবসা করা হবে না ; সেটা বড্ড শঙ্কা-জনক। আমি নূতন রকমের একটা কিছু কর্‌তে চাচ্ছি। স্কুলে যে সব শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে, আমি বাজারে সেগুলো মজুত রেখে বিক্রী কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছি। ওতে তোমাদেরও সুবিধে, নীরদ-দা ! দশখানে আর বিক্রী কর্‌তে হবে না, কেবল আমাকেই দেবে, আর মূল্যের টাকা বুঝে নেবে। অবশ্য আমাকে পাইকারী দরে দিতে হবে ; তা না হ'লে দু'পয়সা রাখা যাবে না।"

"তা পাইকারী দরে না পেলে তোমার দু'পয়সা থাক্‌বে কেন ? তবে কথাটা কি জানো ?—এরূপের ক্ষুদ্র ব্যবসা তোমার উপযুক্ত নয়। কারণ তুমি একটা বড় পুঁজি খাটায়ে খুব লাভবান হতে পার। এতে আর তোমার আয়-বৃদ্ধি কি হবে, বরং ঝঞ্ঝাট হবে বেশী।" বলিয়াই নীরদ কি চিন্তা করিতে লাগিল।

"আমার না হোক্, স্কুলের ত কিছু কিছু হবে। স্কুলে লাভের একটা মোটা অংশ যাবে।" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইহা বলিয়াই ভুবন অনুকূল উত্তরের প্রত্যাশায় সোৎসাহে নীরদের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে নীরদ বলিল, "তা তোমার যখন এমন আগ্রহ, তখন এব্যবস্থা করে নিতে পার্‌বে। আমি আগে মনে করেছিলাম, অনিলকে দিয়ে একাজ করাবো। কিন্তু শেষে ভেবে দেখ্‌লাম্, এতে লাভ যাই হোক্, দুর্ণামটা হবে খুবই বেশী। হেড্‌মাষ্টার নিজের ভাইকে কম দামে জিনিষ দিচ্ছে, এ অখ্যাতিটা রট্‌তে বেশী সময়

লাগ্‌বে না। তাই সে-সঙ্কল্পটা ছেড়ে দিয়েছি। ওকে দিয়ে কণ্ট্রাক্টারের কাজ করাবো, ভেবেছি। সততার সহিত কাজ কর্‌লে ওতেই নিজের দু'পয়সা হবে, দেশের ও কিছু-না-কিছু হিত কর্‌তে পার্‌বে। তোমার সম্বন্ধেও ও রকমের কথা ওঠ্‌তে পারে। তাই ম্যানেজিং কমিটীর মত নিয়ে কাজ কর্‌লেই ভালো হবে।"

"কমিটী ত নামে মাত্র। যা কর্‌বার্, তুমিই কর্‌ছো নীরদ-দা!"

"না, তা হবে কেন? দশজনকে নিয়ে কমিটী; সকলকেই জানাতে হবে। কমিটীর মত নিয়ে কোনো কাজ কর্‌লে, পরে আর কেউ দোষ দিতে পার্‌বে না।"

"তবে তাই হ'বে। কমিটী বস্‌বে কবে?"

"কাল নূতন কমিটীর গঠন হ'বে, সে সংবাদ রাখো কি?"

"তা রাখ্‌বার্ মত আমার অবসর কোথায়? এখন না রাখ্‌লে ত আর চল্‌বে না। গিন্নীও যে সেজন্য খুব পীড়াপীড়ি কর্‌ছে।" ইহা বলিয়াই ভুবন আড়চোখে বন্ধুর চোখের দিকে একবার চাহিল।

"আগের কমিটীটা কয়জন ভদ্র বিশিষ্ট লোক নিয়েই গঠন করা হয়েছিল। কেন তা করা হয়েছিল, তা ত জানো। এখন নতুন করে আবার গঠন না কর্‌লে আর চল্‌ছে না। কয়জন ভদ্রলোকই দেশের সব নয়, চাষা-ভূষার সংখ্যাই বেশী। তাদেরে বাদ দিলে দেশের ঘোর অনিষ্ট। তাই ভেবেছি, কালাচাঁদ মণ্ডল, রহমান মোল্লা, করিম সেখ, আবদুল খাঁ, গোলোক বণিক, আর মথুরা নাথকে কমিটীতে

নেয়া হবে। কি বলো, এতে কাজ ভালো হ'বে না?" ইহা বলিয়া নীরদ ভুবনের অভিমত শুনিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভুবন আজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উপস্থিত। মনে থাকিলেও মুখে সে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে বরং জোরেই বলিল, "নিশ্চয়ই এতে শুভ হবে। তুমি যা করবে, তার বিরুদ্ধে মত দেবার মত লোক এদেশে ত জন্মায় নি' নীরদ দা। তুমি যে শুধু দেশের হিতের জন্যই এ সব করছো, তা সকলকে একবাক্যে স্বীকার করতেই হবে, আমিও তা করছি। তা হ'লে কাল ত আর কিছুই হচ্ছে না, শুধু কমিটীর গঠন হয়েই কাজ শেষ করা হবে। পরের কমিটীটা কখন বসবে, অবশ্য জানাবে।"

নীরদ এ কথায় বড়ই বিরক্ত হইল, বলিল, "জানাবো কেন?—তুমি নিজেই জানবে। কাল তোমায়ও উপস্থিত থাকতে হবে নূতন কমিটীতে তোমায়ও নেয়া হবে।"

১৯

স্বামী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করায় গৃহ-দেবতা সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর অর্চ্চনা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে বীণা মনস্থ করিল। যুগ্ম ছাগ বলি দিয়া দেবীর তৃপ্তি সাধন করিতে সে 'মানত' রাখিয়াছিল; তাহা ত করিতেই হইবে, তা ছাড়া চণ্ডী-পাঠ, ব্রাহ্মণ-ভোজন,

কাঙ্গালী বিদায়ও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং আত্মীয়-কুটুম্ব-দিগকে বাড়ীতে আনান হইবে, স্থির করিল। সে স্বামীর কাছে অভিপ্রায় জানাইয়া খরচের জন্য একশ টাকা চাহিল।

নীরদ পত্নীর কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমি যে তিন দিনের জ্বরেই ইহধাম হ'তে পালিয়ে যাবো, তেমন কোনো লক্ষণ দেখেছিলে কি? একশ টাকা ত চেয়ে বস্‌লে এখুনি; একশ আমার ক'মাসের রোজগার, তার খবর রাখো কি?"

বীণা মুহূর্ত্তকাল মুখ ভারী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, "তা রাখিনি বটে, কিন্তু সেজন্য সাংসারিক কোনো বিষয়ে ঠেকাও ত পড়েনি, অবাধে সব কাজ চলে যাচ্ছে। আজ আমি নিজের জন্য টাকা চাচ্ছি বলে, এত কথা ওঠ্‌লো।"

নীরদ স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে বলিল, "সেজন্য নয় বীণে,—সেজন্য নয়। তিনদিনের মধ্যে অনিলকে দু'শ টাকা দিতে হবে। তথাপি তোমায় যেরূপেই হোক্, একশ টাকা সংগ্রহ করে দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, যদি তুমি তা বস্তুতঃ নিজের কি সংসারের কাজে খরচ কর্‌তে। তুমি নিজে যা কিছু খরচ করো, তাতেও হয় সংসারের, না হয়, দশের কাজই করো। এটা ত সেরূপের খরচা নয়, বীণে!"

বীণা ক্ষণকাল বিস্ময়াবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কথাটার মর্ম্মই বুঝিতে পারিল না। তৎপর সেই জড় ভাব কাটিয়া গেলে বলিল, "পূজোটা যে সংসারের কাজের বাইরে, আজ তা নতুন শুন্‌লাম। তবে পূজার্চ্চনায় তোমার নিষ্ঠা নেই নাকি?"

"পূজার্চ্চনায় নিষ্ঠা থাকা ত পরম সৌভাগ্যের কথা। তাতে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়,—মানসিক উন্নতি হয়। তাতে নিষ্ঠা না থাক্‌লে কি আর আমি শুধু শুধু এত গুলো বিগ্রহের পূজার্চ্চনার খরচ বহন কর্‌ছি? তবে তুমি যেরূপ পূজার আয়োজন কর্‌তে যাচ্ছ, আমি ওরূপ পূজার পক্ষপাতী নই। এতে খাঁটি পূজা হয় না।" ইহা বলিয়া নীরদ কি ভাবিতে লাগিল।

বীণা আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "পূজো খাঁটি হ'বে না, তার অর্থ কি? মা কি তবে পূজো গ্রহণ কর্‌বেন্ না? তাহ'লে তোমার মতে পূজোর পদ্ধতিটা কিরূপ হবে, তা শুন্‌তে পারি কি?"

"আমার মতে যে পূজায় ধর্ম্মের নামে নিরীহ পশুকে হত্যা করা হয়, মা কখনই সে পূজা গ্রহণ করেন না। সব জীবই মার সন্তান; পশুগুলোর বুদ্ধি নেই বলেই মানুষে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ওদের ওপর যখন তখন অত্যাচার চালায়ে আস্‌ছে, প্রাণেও বধ কর্‌ছে। কিন্তু অবোধ অপটু সন্তানের ওপরই ত মার অধিক স্নেহ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পশু-বলি দিয়ে পূজা কর্‌লে ধর্ম্মলাভ হবে বলে ভ্রান্ত ধারণা আমি পোষণ করি নে।" এ কথা বলিয়াই নীরদ নীরব হইলে তাহার বক্ষ হইতে একটী গভীর নিশ্বাস নির্গত হইল।

স্বামীর কথায় বীণা মনে মনে প্রমাদ গণিল, পাছে দেবতা রুষ্ট হইয়া বিপদ ঘটায়, সে আশঙ্কায় বড়ই আকুল হইল। সে দাঁতে জিহ্বা কাটিয়া বলিল, "পশু-বলি দিয়ে পূজো করার রীতিটা চিরকাল চলে আস্‌ছে, আজ নয়। তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরাও তা করেছেন।

তবে কি তাঁরা সবে মূর্খ্য ছিলেন? আচ্ছা, বলি-দানের অর্থটা কি, তবে বল দিকিনি?”

“তাঁরা কখনই মূর্খ ছিলেন না; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ ও পবিত্র। হৃদয়স্থ অজ্ঞানরূপ পশুকে বলি না দিলে দেবতার স্বরূপ আত্মায় প্রকাশিত হয় না; সুতরাং পূজার চরম ফলও পাওয়া যায় না। মানস পূজা সেভাবেই কর্‌তে হয়; বাহিরে একটা পশু বলি দিয়ে স্থূলভাবে পূজো করা হয়। তা' পরে বোঝবে; এ সব বড় উচ্চ বিষয়; এখুনি তোমায় সব বোঝাতে পার্‌বো না। সাধক কাঙ্গাল মায়ের পূজায় পশুবলি দেয়া সম্বন্ধে কি বলেছেন, শুন :—

'বনের মহিষ-অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।'

কেমন উচ্চ কথা বীণে! এটাই ত আসল পূজো! এম্‌নিভাবে না কর্‌তে পার্‌লে পূজো খাঁটি হয় না।”

বলিতে বলিতে নীরদের বক্ষটা উচ্ছ্বসিত হইল। সে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল! বীণাও ক্ষণকাল কি ভাবিল, তারপর তাহার বক্ষ-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইলে সে উঠিয়া গেল।

বীণা দেখিল, যুক্তি-তর্কে পণ্ডিত স্বামীকে হারান অসম্ভব। সুতরাং সে শাশুড়ীর শরণ লইতে গেল। কিন্তু নীরদ তাহার

উদারহৃদয়া মাতার গুণই বিশেষভাবে পাইয়াছিল এবং মাতার কাছে অনেক নীতিশিক্ষা লাভ করিয়াছিল। সত্যবতী কোনদিন অন্ধ বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন করেন নাই এবং সাত্ত্বিক পূজার পক্ষে ছিলেন বলিয়া পশুবলিদানে নারাজ। মা-সর্ব্বমঙ্গলার মানৎ রাখিয়া তাহা না দিতে গেলে স্বামীর অমঙ্গল হইতে পারে, বীণা এ যুক্তি উত্থাপন করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মা, তুমি এখনো বালিকা, ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? দুটী জীবের জীবন নষ্ট করে তুমি স্বামীর জীবন রক্ষা কর্‌তে চাচ্ছ, এ নিষ্ঠুরতায় কি মার মন সায় দিতে পারে? মা কি এমনি নীচ যে, তুমি পূজো কর্‌বে বলে, তিনি আপন সন্তানকে খেয়ে খুসী হবেন? এমন পূজোয় মার কখনি প্রীতি হতে পারে না। মা দেখেন হৃদয়, কাজ নয়। একমনে মাকে ডাক্‌লেই মা সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট ফল দিয়ে থাকেন। তুমিও তাই করো, মা!"

এদিকেও অনুকূল মত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বীণা একটী রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া গৃহকর্ম্মে গমন করিল। তাহার নিরাশার বার্ত্তা অচিরে সখী মনোরমার কাণে গেল। সে পরবর্ত্তী রবিবারেই একটু আগে আহারাদি সারিয়া পরিপাটিরূপে বেশভুষা করিয়া সখীর সহিত দেখা করিতে গেল। সে-বাড়ীতে পৌঁছিয়াই মনোরমা আগে বীণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় সবিশেষ জানিল, তারপর নীরদের ঘরে গিয়া তাহাকে খোঁচা দিবার জন্য হাসিয়া বলিল,—"হেড মাষ্টারবাবু, আপনি ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বই পড়েছেন, কলকাতার উন্নত সমাজেও অনেক কাল

কাটিয়েছেন ; তথাপি পৌত্তলিকতায় আপনার এমন অনুরাগ কেন, বুঝ্ছি নে। আপনি না আবার সংস্কারের পক্ষপাতী ?"

ঘাড় নাড়িয়া কথা বলায় মনোরমার মাথার জরির কল্কাকরা দামী রেশমী শাড়ীটা পিছনের দিকে সরিয়া পড়িয়া খোঁপার উপর ঝুলিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। নীরদও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই ; কিন্তু করিয়াছিল আর একজন,— সে বীণা। তাহাতে তাহার মর্ম্মটা যেন তীক্ষ্ণ কণ্টকে বিদ্ধ হইতেছিল। কিন্তু মুখ ফুটাইবার যে যোটি নাই, মনোরমা আজ তাহারই পক্ষে দুকথা বলিতে আসিয়াছে ; সুতরাং তাহার শত লঘুতাকেও উপেক্ষা করিতে হয়। সে যে কতখানি ধৈর্য্যের সহিত এ দুঃসহ মনোবেদনা মনের অন্তরালে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিতেছিল, তাহা পত্নীর মুখপানে একবার তাকাইলেই নীরদ ধরিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা করে নাই ; তাহার মন মনোরমার কথার মর্ম্ম গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। সে উপহাসের ছলে হাসিয়া বলিল, "আপনি কি আমায় ব্রাহ্ম হতে বলেন না কি ? বুঝেছি, ঢাকার ব্রাহ্ম পরিবারে আপনার শিক্ষা ; তাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি এমন মনের টান।"

মনোরমা বাঁ হাতের ছোট্ট অঙ্গুলীগুলি ধীরে ধীরে নাড়িয়া বলিল, "না—না, আমি আপনাকে ব্রাহ্ম হতে বল্ছিনে ; আমি নিজেও কিছু ব্রাহ্ম নই। আর ব্রাহ্ম হলেই বা দোষের কথা কি ? ব্রহ্মনিষ্ঠকেই ত ব্রাহ্ম বলা হয় ; এবং ব্রহ্মজ্ঞানেই ত মানবত্ব। আমি জান্তে চাচ্ছি, সংস্কার করে আপনারা কি ভাবে

ধর্ম্মটাকে গড়ে তুল্‌তে চাচ্ছেন। পূজার্চ্চায় ত আপনাদের আর আস্থা নেই।"

নীরদ উচ্চহাস্যে কক্ষটা পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, "আপনার সখীর পক্ষে ব্যারিষ্টার হয়ে এলেন না কি? আপনার স্বামী কিন্তু এক দিন ব্যারিষ্টার হবে, বলেছিল। আজ তাহ'লে আপনি তার স্থলে…"

মনোরমা ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিল, "না, নীরোদবাবু, ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়। আমি অন্তরের সহিত বল্‌ছি, আমায় সংস্কারের কথাটা স্পষ্ট করে আগে আপনি বলুন।"

নীরদের সহাস্য বদন ম্লান হইল না; সে বলিল, "যদি এখ্‌খুনি না বলা হয়, আপনার স্বার্থহানি ঘটবে না কি? ক্ষিটা বুঝি তা'হলে পূরোপুরি—"

আর বলিতে না দিয়া মনোরমা তৎক্ষণাৎ তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া রাগতভাবে বলিল, "আবার সে কথা!" পরক্ষণেই বিরক্তিব্যঞ্জক সুরে চক্ষু নত করিয়া সে আবার বলিল, "আপনি তবে আমায় বল্‌বার অযোগ্যই মনে কর্‌ছেন?"

মনোরমার রাগে নীরদ বড়ই আমোদ বোধ করিল, বলিল, "কি বল্‌তে হবে খুলেই বলুন না। সংস্কার যে এখুনি আমরা কর্‌তে যাচ্ছি, তা আপনাকে কে বল্লে? ধর্ম্ম-সংস্কারের ন্যায় কঠিন কাজে হাত দেবার মত সময় এখনো সমাজে আসে নি।"

মনোরমা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাঃ! সমিতির খাতায় দেখ্‌লাম্, ধর্ম্ম-সংস্কারও সমাজ-সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে কি ওসব আপনাদের কারসাজি?"

"আমাদের কারসাজি নিশ্চয়ই না; সময়ে কর্‌বার চেষ্টা চল্‌বে। সব বিষয়ে এক কালে হাত দিলে সাম্‌লান যে দায় হবে।"

"তা' হ'লে আপনি সইকে পূজো কর্‌তে দিলেন না কেন? আপনার অভিপ্রায়টা কি, শুন্‌তে পারি?" ইহা বলিয়া মনোরমা নীরদের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিল।

মনোরমাকে আবার একটু রাগাইবার জন্য নীরদ বলিল, "তা শুনেই বা কি হ'বে? তাতে ত আর আপনার সই পূজার অনুমতি পাবে না।"

মনোরমা এবার দস্তুর মাফিক্ রাগ করিল; তারপর ধমক দিয়া বলিল, "কেন পাবে না অনুমতি? আপনি কি যা' তা' একটা কিছু বল্লেই আমরা মেয়ে-মানুষে তা অবনত মস্তকে মেনে নেব? আমাদেরো ত বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু আছে বুঝি, যা দিয়ে আমরা বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারি? পুরুষে যা বল্‌বে, তাই যে সব সময়ে ঠিক হবে, তারো ত কিছু প্রমাণ নেই!"

নীরদ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "আমার মতে পুরুষের কথাই ত মেয়েদের মানা উচিত।"

"অর্থাৎ মেয়েদের উচিত, বিনা বাক্যব্যয়ে পুরুষের মন যোগান, —দাসত্ব করা!" অল্প উষ্মার সুরে এ কথা কয়টী বলিয়াই মনোরমা নীরদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

নীরদ গম্ভীর হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "আমি বল্‌ছি, তাতেই ত মেয়েদের গৌরব।"

এবার মনোরমার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। সে ক্ষোভে ও রোষে চক্ষু লাল করিয়া বলিল, "কিঃ! আপনি এমন শিক্ষিত হয়েও মেয়েদের দাসী ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌ছেন না? অন্যের কথা যাই হোক্‌, আপনার মত উদার-হৃদয় সুশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এ কথা শোন্‌বো, তা কখনি ভাবি নি। আপনার কথাগুলো আন্তরিক হ'লে আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি, আপনাদের সংস্কারের কথা-গুলো নেহাত বাজে, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দেশ-হিতের পোষাকে ঢাকা নিছক্‌ ভণ্ডামি!"

মনোরমাকে আর রাগাইতে ভরসা না পাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য নীরদ বলিল, "আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না! আমি সত্যই কি আর মেয়েদের ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌ছি যে, আপনি আমাদের সমিতির নিন্দা না করে পার্‌লেন না! মেয়েদের সহিষ্ণুতা খুব বেশী; তাই তারা সেবা-শুশ্রূষার কাজে ধৈর্য্য হারায় না এবং ইচ্ছে করেই সে কাজ করে থাকে। সেজন্য মেয়েদের দাসী বলে তুচ্ছ করা নেহাত বোকামি বই আর কিছুই নয়। আপনি ত আর কিছু সেরূপের মেয়েও নন!"

মনোরমা বিস্ময়ের চক্ষে চাহিয়া বলিল, "তার মানে?"

"আপনি চিরদিন অনেককে খাটায়ে আস্‌ছেন, কোনদিনই নিজে খাটেন নি।"

"অর্থাৎ আমি রাজরাণী হ'লে অন্যে মেয়েদের গালি দিয়ে অপমান কর্‌লেও নীরবে সহ্য কর্‌বো?"—বলিয়া মনোরমা চক্ষু রাঙ্গা করিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নীরদ তাহাকে জব্দ করিবার জন্য বলিল, "সহ্য করা একটী মহৎ গুণ। মেয়েরা সহ্য কর্‌তে পারে বলেই সমাজটাকে এমন সজীব রেখেছে এবং সেজন্য সমাজে তাদের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আমি অবশ্য আমাদের পল্লী-সমাজের কথাই বল্‌ছি। এ সমাজ মেয়েদের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী; মেয়েরাই হাতে করে সমাজটাকে তুলে ধরেছে এবং সাধ করেই মাতার ন্যায় সমাজকে সর্ব্বদা পোষণ কর্‌ছে। মেয়েরা ধাত্রী বলেই দাসী; এই দাসীর কাজ যে যথেষ্ট গৌরবের, তা কি আপনি অস্বীকার কর্‌তে চান?"

"অস্বীকার যেন নাই কর্‌লাম; কিন্তু .." বলিতেই মনোরমাকে থামাইয়া দিয়া নীরদ নিজে বলিল, "থামুন—থামুন; তা যদি অস্বীকার না কর্‌লেন, তবে এও স্বীকার করুন যে, আপনারো সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক।"

মনোরমা এবার অসহিষ্ণুই হইল এবং ঘা খাইয়া রুষ্টভাবে বলিল, "অর্থাৎ আমার সহিষ্ণুতার অভাব, তাই আপনি আমায় এ উপদেশ দিচ্ছেন; নয় কি?"

নীরদ হো-হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "আপনার বুদ্ধিটা দেখ্‌ছি খুব প্রখরা; মুখটাও নেহাত কম নয়!"

ইহাতে মনোরমা ভিতরে খুব চটিল; কিন্তু বাহিরে তাহাকে সেভাব গোপন করিতে হইল। সে এবার স্বরটা নীচু করিয়াই বলিল, "আমি মুখরা হ'লেও আপনার সঙ্গে পার্‌ছি কৈ? আপনারই ত কথায় কথায় জয় হচ্ছে! আর পুরুষ মানুষের সঙ্গে পেরে উঠাও

যে ভার। আপনি এখন জয়-পতাকা উড়ায়ে আসল কথাটাই বলুন,—সইকে পূজো করতে বারণ করলেন কেন?"

নীরদ আর কথা কাটাকাটি করিতে চাহিল না; কারণ উহাতে বারংবার মনোরমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় মাত্র। তাই সে কাজের কথা পাড়িবার জন্য বলিল, "কৈ, আপনার সইকে পূজো করতে তো বারণ করা হয় নি।"

"সই পাঁঠা বলি দিয়ে পূজো করতে চেয়েছিল, আপনি তাতে মত দেন নি।"

"হাঁ, তা দিই নি। সাত্ত্বিক পূজায় উৎসাহ দেবার জন্যই পাঁঠা বলি দিতে নিষেধ করেছি। আপনি কি পূজায় পশুবলি দেয়াটা সমর্থন করেন?"

"আমার সমর্থন করায় না করায় কিছু যায় আসে না। আমি আদতে সাকার পূজোই পছন্দ করি নে। যাক্ সে কথা। আপনি শাক্ত হয়ে শক্তির পূজায় বলি দিতে নিষেধ করছেন কেন? ওটা ত শাস্ত্রেরই বিধি।"

"শাস্ত্রের মর্ম্ম কয়জনে বোঝে? যে জন্য শাস্ত্রে বিধি, সেজন্যই আবার নিষেধও রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি পূজোপাসনার উদ্দেশ্য হয়, তবে পূজায় পশুবলি না দেয়াই সঙ্গত। যে পারবে, সে আত্মবলিই দিবে; পশুবলি দিয়ে সাত্ত্বিকতার হানি করবে কেন?"

"আচ্ছা নীরদবাবু, তান্ত্রিক সাধনায় যে মদ্য-মাংস প্রভৃতি ব্যবহারের বিধি রয়েছে, সেগুলো কি সাধনার সাহায্যকারী, না সেগুলোতেও সাত্ত্বিকতার হানি করে?"

"সেগুলো সাধনার সাহায্যকারী ঠিক্‌ই। সাধক যোগ-ধ্যানে সমাধিস্থ হ'লে, কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি মূলাধার হতে ষট্‌চক্র অতিক্রম করে সর্ব্বোপরিস্থ সহস্রার পদ্মে উত্থিত হয়। তখন সহস্রার হতে যে সুধার ধারা ক্ষরিত হয়, সাধক আনন্দে তাহাই পান করে বিভোর হন। ইহাই হ'ল মদ্য পান। মাংস-ভক্ষণও ঠিক জীব-মাংস ভোজন নয়,—আপনার বাক্য সংযম করা; মতান্তরে পরমেশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণের নাম মাংসাহার। এরূপেই সাধক সাত্বিক-ভাবে পঞ্চমুদ্রার প্রত্যেকটীকে উপভোগ করে সাধনায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং প্রকৃত তান্ত্রিক সাধক যে সাধনা করেন, তা সাত্বিক। কিন্তু পশুবলি দিয়ে যে পূজার্চ্চনা করা হয়, তা সাত্বিক নয়, তামসিক। এখন ত মাংসাশী লোকেরা শুধু উদর-পূজার জন্যও নিরীহ জীবগুলোকে হত্যা আর নেশার জন্য মদ্যপান কর্‌ছে, আত্মশুদ্ধির কথা ভুলেও ভাব্‌ছে না। হিংসাবৃত্তি যে পাপের কাজ, তা তাদের ধারণায়ই আস্‌ছে না।"

মনোরমা সবিদ্রূপ হাসিয়া বলিল, "আপনি নিজে মাংস খান না বলে অপরকে মাংসাশী বলে নিন্দা কর্‌ছেন কেন? মাংস খেলে ত শরীরে খুব জোর হয়, আর তাতে কর্ম্মশক্তিও বেশ বাড়ে। সুতরাং কর্ম্মীদের পক্ষে মাংসাহারই ত দরকার।"

নীরদও ব্যঙ্গ বাক্য ব্যবহার করিতে ছাড়িল না; সে বলিল, "দেখ্‌ছি, আপনিও যে এক শাস্ত্র-বিদ্‌ মহা পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লেন! কে বল্লে আপনাকে, মাংসাহারে কর্ম্মশক্তি বাড়ে? ভোগ-সুখরত গৃহীদের চেয়ে ফল-মূলভোজী সাধু-সন্ন্যাসীদের কাজ কর্‌বার

ক্ষমতা যে ঢের বেশী ! তাঁদের সহিষ্ণুতারও সীমা নেই ! মাংসাহারে শরীরে ক্ষণিক উত্তেজনা জন্মায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ অবসাদ এসে অভিভূত করে ফেলে। দেবাসুরের দ্বন্দ্বের কথা ত পুরাণাদিতে অনেক শুনেছেন। সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবতারা নানারূপ লাঞ্ছনা-যাতনার মধ্য দিয়েই শেষে জয়ী হয়েছিলেন, আর রজোগুণ বিশিষ্ট অসুরেরা ভোগ-বাসনার অনলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষে পতঙ্গের মত জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল ! কিন্তু তা হলেও কেউ মাংস খাচ্ছে বলে আমি তাকে ঘৃণা করছি নে। আমি বল্‌ছি, আমাদের সত্ত্বগুণ অর্জ্জন করে শুদ্ধ হতে হবে, আর সর্ব্বদা সরল সত্যপথে চল্‌তে হবে। তা না হলে আমরা 'যে তিমিরে, চিরদিন সে তিমিরেই' থাক্‌বো ; দারুণ বুক-ফাটা কান্নাকাটী আর আবেগভরা আর্ত্তনাদ কর্‌লেও কেউ কখনই দয়া করে আমাদের এ আঁধার কাটিয়ে দেবে না,—নিজের চেষ্টায় না উঠ্‌লে কেউ ধরে তুল্‌তে আস্‌বে না।"

মনোরমা আবার ব্যঙ্গভরা ভাষায় বলিল, "তবু ভালো যে, মাংসভোজীদের একেবারে তমোগুণের তমোময় কূপ-গর্ভে দয়া করে আপনি ফেলে দিলেন না ! তারপর আমরা মানুষ নই, আমাদের আবার উঠ্‌বার চেষ্টা ! আমরা উঠ্‌লে পরে আরামে ঘুমুবে কে, বলুন দিখিনি !"

নীরদ স্বাভাবিক গম্ভীরভাষায় বলিল, "তাও অসম্ভব কিছুই নয় ;—পতনের দিকে গমনটাই যে সব সময় নেহাত সহজ। আর মাঝে ত কেউ কখনি টিকে থাকতে পারেনা। হয় তাকে উপরের

দিকে উঠ্‌তে হবে, না হয় নীচের দিকেই পড়্‌তে হবে। উপর দিকে উঠ্‌তে না পার্‌লে মুক্তির বাতাস পাবার আশা নেই, নীচে পড়ে পচে-গলে ভোগ্‌তেই হবে,—জগতের সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকৃতে হবে। এখন আমাদের সকলেরই দরকার—মোহ-নিদ্রা থেকে জেগে সতর্ক হয়ে উঠ্‌বার চেষ্টা করা,—মানুষ বলে জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করৃতে কঠোর সাধনা করা। হতাশ হলে চল্‌বে কেন? আপনাকে অজর আর অমর জ্ঞান করেই বীরের মতন কাজ করৃতে হবে,—বাধা বিঘ্নের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝ্‌তে হবে।"

"আচ্ছা হেড্‌মাষ্টারবাবু, আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সব জাতের সাধারণ ধর্ম্মমন্দির রয়েছে; নাই কেবল হিন্দুদের। হিন্দুদের ঐরূপ একটী ধর্ম্মাগার থাকৃলে ত সবে একস্থানে মিলিত হয়ে ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতাদি করৃতে পারে। তাতে সকলের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার আর অবাধে মেলা-মেশা হতে পারে; তাতে জাতীয় শক্তিও অনেক বাড়ে, হিন্দুরা একটা বড় জাত বলে আত্ম-পরিচয় দিতে পারে। কি বলুন,—পারে না কি?" বলিয়াই মনোরমা নীরদের মত শুনিবার জন্য তাহার মুখের দিকে সোৎসাহে তাকাইল।

নীরদ-গম্ভীর-নিস্বণে নীরদ বলিতে লাগিল, "হাঁ, তা ত পারেই। যে মিলনের মূলে ধর্ম্মভাব প্রবল, তা সুদৃঢ়ই হয়ে থাকে। অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বলে জাতির বিশাল অংশকে দূরে সরায়ে রাখ্‌লে জাতি যে দুর্ব্বল আর পঙ্গু হয়ে পড়ে, তা আমরা ভুলেও ভাব্‌ছি নে! ছুঁৎমার্গরূপ জঘন্য পাশবিক প্রথার অপমানে ব্যথিত হয়েই লক্ষ লক্ষ

হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে। এ লোকাচারের প্রতি অন্ধ অনুরাগ বর্জ্জন করে তাদের উচ্চতর অধিকার না দিলে জাতীয় সঙ্ঘ-শক্তি-গঠনের সম্ভাবনা নেই। এ মিথ্যা ও অসত্যের প্রশ্রয় দিতে গেলে মনুষ্যত্বের অবমাননাই যে করা হয়! যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মানবাত্মার মাহাত্ম্য অতি প্রাচীনকাল হতে প্রচার করে আস্‌ছে, তার সুবিশাল সমুজ্জ্বল বক্ষে অনুদার সঙ্কীর্ণতা আর অজ্ঞানজ কুসংস্কারের স্থান কোথায়? মহাত্মা কাঙ্গাল কি বলেছেন, শুনুন—

‘কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত বিচারে,
শক্তি-পূজা হয় না;
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক ‘মা’ বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।’

হিন্দুদের সকল বর্ণ এক সাধারণ ধর্ম্মমন্দিরে মিলিত হয়ে ধর্ম্মালোচনা কর্‌লেও অনেক কাজ হতে পারে।” ইহা বলিয়া নীরদ শান্ত-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে চাহিল।

নীরদের মহত্ত্বপূর্ণ উদার হৃদয়ের উচ্চ ভাবরাশি তরল প্রবাহের মত তাহার জ্ঞানগর্ভ গম্ভীর ভাষার মধ্য দিয়া উৎসারিত হইয়া মনোরমাকে শ্রদ্ধাসিক্ত করিয়া তুলিল। সে এক্ষণে নীরদের মুখের দিকে তাকাইতেই টের পাইল, তাহার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে, উহা নিতান্ত অসঙ্গত। সে অমনি সলজ্জ সত্বরতার সহিত তাহা উঠাইয়া দিল, তারপর স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বলিল, “এ শ্যামা-সঙ্গীতটী আমি জানি; ইহার ভাব খুব উচ্চ, অমূল্য উপদেশপূর্ণ। আচ্ছা

নীরদ বাবু, তা হলে আপনারা দেশের হিতের জন্য হিন্দুদের তেমন একটা সাধারণ ধর্ম্মমন্দির স্থাপনের উদ্যোগ করুন না কেন ?"

নীরদ ঈষৎ হাসিয়া বলিতে লাগিল, "উদ্যোগ করা এক কথা, আর কাজ্য করা অন্য কথা। তেমন একটা বৃহৎ কাজে হাত দিবার মত অর্থ আমাদের কোথায় ? আপনি ত ধনীর গৃহিণী ; আপনি এদেশে তেমন একটা ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করে কীর্ত্তি রাখুন না।"

মনোরমা এবার খোঁচা খাইয়াও চঞ্চলা হইল না, পরন্তু সবিনয়ে বলিল, "আমার কি আর সে সৌভাগ্য হবে ?"

বেলা পড়িয়া আসিলে মনোরমা যেন আজ আপনাকে এক প্রকার ছিঁড়িয়া লইয়া বিদায় হইল। সে বাহিরে গেলে, বীণা হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কালও আস্‌তে হবে, ভাই মনু ! তোমাদের সাত্ত্বিক সাধনার বড় বড় কথাগুলো আমি ত মোটেই ধর্‌তে পার্‌লাম না। কাল এসে আমায় বোঝাতে হবে।"

মনোরমা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "তোমার কর্ত্তা-মশায়ই তোমায় বোঝাবেন ; আমার জ্ঞান কি আর তাঁর চেয়ে বেশী, ভাই বীণু ! আর আমি আসিই বা কি করে ? বাড়ীর বের হলেই পাড়াময় কানা ঘুসো কত কথা উঠে।—সে সব মুখে আন্‌তেও ঘেন্না হয় ! তাতে ক্ষেপা কর্ত্তা-মশাই আরো ক্ষেপে উঠেন।"

বীণাও ঈষৎ হাসিল ; বলিল, "থাক্ ভাই, তবে তোমার ক্ষেপা কর্ত্তা-মশাইকে আর ক্ষেপায়ে দরকার নেই ; আমিই না হয় একদিন তোমাদের ওখানে যাবো।"

২০

সুবাসগঞ্জের বাজারে ভুবন কারবার খুলিবার পর এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। একটা সামান্য কথায় তিন জন নমঃশূদ্র ও দুইজন মুসলমানের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইয়া বিবাদ বাধিল। ক্রমশঃ দুইদলে লোক জুটিয়া প্রথমতঃ কথা কাটাকাটি, পরে গালাগালি হইতে হাতাহাতি হইয়া লাঠালাঠি আরম্ভ হইল, অবশেষে মারামারিটা এমন জমাট বাধিল যে, দুই পক্ষেরই অনেকের মাথা ফাটাফাটি হইল; কেহ কেহ রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। বলাই ভুবনের দোকান ঘরে বসিয়া কারবার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল; হঠাৎ কল কোলাহল শ্রবণে চমকিত হইয়া সে বাহিরে গেল এবং পলায়মান লোকদিগের কাছে শুনিল, নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে মারামারি হইয়া বহু লোক আহত হইয়াছে। ঘরের দরজা হইতে সে ভুবনকে ডাকিয়া বলিল, "ভুবন-দা, উত্তর বাজারের দিগে শীগ্‌গীর এসো,—তুমুল মারামারি হচ্ছে।" ইহা বলিয়াই সে সে-দিকে ছুটিয়া গিয়া বেগে জনতার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল।

একজন মুসলমান যুবককে কয়েকজন নমঃশূদ্র নির্দ্দয় প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছিল। ইহা দেখিয়াই বলাই তাহাদিগকে বাধা দিতে গেল এবং দুইহাতে দুইজনের লাঠি চাপিয়া ধরিলেও আর

একজনের লাঠি তাহার বুকের উপর পড়িল। তাহাতে বলাই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বলাই ভূপতিত হওয়ায় মারামারিটা হঠাৎ থামিয়া গেল, যেন প্রজ্জ্বলিত অনল জল প্লাবনে নিবিল। বলাই হিন্দুমুসলমান, সকলেরই অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। তাহার উপর অকস্মাৎ বিপদপাত হওয়ায় সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল; মত্ততার বশে জ্ঞান-হারা হইয়া যে সে কুকাণ্ড করিয়াছিল, সেও অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিল। অচিরে এ দুর্ঘটনার কথা বাজারময় ছড়াইয়া পড়িল এবং ভুবনও তাহা জানিতে পারিল। ভুবন তাহার দোকানের অনিষ্ট আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই জিনিষপত্র সামলাইতে ছিল; এখন যদিও সে শুনিল, বলাই সংজ্ঞাহীন হইয়াছে, তথাপি সে সেদিকে গেল না, ঘরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিয়া ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল।

বলাইয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহন বাজারের ইজারা মহালের জমা আদায় করিতেছিল। সে সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া গেল এবং মূর্চ্ছিত ভ্রাতাকে কয়েকজন লোকের সাহায্যে হাসপাতালে লইয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি এক ক্রোশ দূরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন মোহন পাল্কী করিয়া ভ্রাতাকে বাড়ী লইয়া গেল এবং চিকিৎসার জন্য স্বগ্রামের ডাক্তার কেশববাবুকে ডাকিল।

কেশববাবু এখন পুরাণ ডাক্তার, সকলেই তাঁহাকে ডাকে; সুতরাং দু'টাকা ভিজিট হাতে না লইয়া তিনি রোগী দেখিতে যান না। রাত্রিতে তিনি তিনচার টাকা ভিজিট লন, রোগীর অবস্থা গুরুতর

জানিলে আরও বেশী আদায় করেন। মোহন যখন রাত্রি এগারটার সময় তাঁহাকে ডাকিতে গেল, তখন রোগের গুরুত্ব ও রোগীর স্বচ্ছলতা, এই দুই অনুকুল অবস্থার বিচার করিয়া তিনি ন্যূনকল্পে ছ'টাকা আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কোন টাকা ত চাহিলেনই না, যাইতেও তিলমাত্র ওজর-আপত্তি করিলেন না। বরং ব্যস্ততার সহিত তাড়াতাড়ি না খাইয়াই রোগী দেখিতে গেলেন।

মনোরমা পিত্রালয়ে গিয়াছিল। যাইবার কালে পিতাকে সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, যেন রোগীর যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হয় এবং ভিজিট বাবদে এক কপর্দ্দকও না লওয়া হয়। কেশববাবু বলিলেন, "বলাইকে দেখে ভিজিট নেব, তুমি ভাবছো মা? ওকে চিকিৎসা করার সুযোগ পাওয়াই যে ভাগ্যির কথা! ওকে সুস্থ কর্‌তে পার্‌লে ত গৌরবের সীমাই নেই, দেশের পক্ষেও একটা মহা লাভ।"

রাত্রি একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারবাবু দেখিলেন, কেবল মনোরমা তাঁহার প্রতিক্ষায় বসিয়া আছে, অন্য সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পিতাকে দেখিয়াই মনোরমা বলাইয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। কেশববাবু বলিলেন, "আধঘণ্টা হয় মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে; কিন্তু অবস্থা বড্ড মন্দ।"

মনোরমা ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, "জীবনের আশঙ্কার কথা ত কিছুই নয়?" কেশববাবু বলিলেন, "তা বলা যায় না, মা! বড্ড বেশী আঘাত লেগেছে—বুকে। ছোট থাকৃতেও একবার গাছ

থেকে পড়ে বুকে চোট পেয়েছিল। এখন এককালে দুটো চোটের ব্যথা সাম্‌লান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে এখুনি ঠিক ঠিক কিছু বলা যায় না, কাল সকালে স্পষ্ট বোঝা যাবে। জ্বর না আস্‌লে হয়; আজ না চতুর্দ্দশী, মা!"

মনোরমার বক্ষ হইতে একটী গভীর নিশ্বাস আস্তে আস্তে সরিতে লাগিল; সে বলিল, "হাঁ বাবা, আজ চতুর্দ্দশী। কাল পূর্ণিমায় রোগটা না বাড়্‌লে হয়। আচ্ছা রোগীকে দেখ্‌তে আমাদের বাড়ীর কি নীরদ বাবুদের বাড়ীর কেউ কি এসেছেন বাবা?"

কেশববাবু বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "তোমাদের বাড়ীর ত কেউ আসে নি মা! নীরদবাবু নিজেই খবর পাওয়ামাত্র ছুটে এসেছেন। তিনি আজ রাত্তিরে রোগীর কাছেই থাক্‌বেন। তাঁর উপর নির্ভর করেই আমি আস্‌তে পেরেছি। চিকিৎসায় নীরদবাবুর বেশ অভিজ্ঞতা। তিনি ডাক্তার হ'লে বোধ হয়, এ অঞ্চলের সকল ডাক্তারের সেরা হ'তেন।"

"ওনি যে বিষয়ে হাত দেন, তাই সফল করে তোলেন;—বেশ গুণবান্ ব্যক্তি। বলাইবাবুও ওনারি মতো গুণী।" বলিয়াই মনোরমা ব্যথিতচিত্তে পিতার আহারের যোগাড়ে উঠিয়া গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় যখন মণ্ডল-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশববাবু জানাইলেন, আর দুই ঘণ্টার বেশী বলাই ইহ-লোকে থাকিবে না, তখন মনোরমার মর্ম্মে যেন শূল বিঁধিতে লাগিল, অপরিমিত দুঃখে ও নিদারুণ নিরাশায় তাহার সুগৌর সমুজ্জ্বল মুখ-

খানি নিমেষে পাণ্ডুর হইয়া গেল! সে দশটার মধ্যে আহারাদি সারিয়া বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বাহিরে বেহারা অপেক্ষা করিতেছিল। সে তখনি পাল্কীতে উঠিয়া মণ্ডল-বাড়ীর দিকে যাইতে বাহকদিগকে আদেশ দিল। পাল্কী সে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে মনোরমা শুনিতে পাইল, বাড়ীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। তথাপি পাল্কী সে বাড়ীর দিকেই যাইতে লাগিল; কারণ মনোরমা স্বামীর প্রাণদাতা বন্ধুকে শেষ মুহূর্ত্তে একবার দেখা কর্ত্তব্য বোধ করিল। পাল্কী হইতে নামিলেই নীরদ তাহাকে মৃত্যু-শয্যাশায়িত বন্ধুর কাছে লইয়া গেল এবং তাহার সম্মুখে বসিতে বলিল। মৃত্যু-ছায়া বলাইয়ের চৈতন্যকে তখনও একবারে আচ্ছন্ন করে নাই, সে অপরিচিত একজন স্ত্রীলোককে নিকটে দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নীরদ তাহার পরিচয় দিয়া জানাইল, সে-ই স্বামীর প্রতিনিধি স্বরূপে অন্তিমকালে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। দীপ শিখার অন্তিম উজ্জ্বলতার ন্যায় বলাইয়ের রক্তহীন বিশুষ্ক অধরে হাসির ছটা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেও ক্ষণকালের জন্য। পরক্ষণেই ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে মিশিয়া গেল, আঁখির স্ফুরণও নিবিল, সব ফুরাইল। মনোরমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিল, নীরদের নেত্র-কোণেও দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নেত্র-নীর ঝরিল! স্বামীর মৃত বন্ধুকে শেষবার দেখিতে দেখিতে মনোরমা পাল্কীতে গিয়া উঠিল এবং নীরদকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "কারো আপত্তি না হলে, আমি এ শবটী চাচ্ছি। আপনি দয়া করে এইটে কোনো স্বতন্ত্র স্থানে দাহ করাবেন,

নোবল্ লাইফের (সাধু জীবনের) একটা স্মৃতি রাখ্তে চেষ্টা করবো।"

মনোরমার ইচ্ছামতই কাজ হইল। নীরদ প্রিয়তম বন্ধু হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া শুধু শেষ-সম্বল স্মৃতিটুকু লইয়া রাত্রি সাত-টার সময় ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া সত্য-বতী সবিষাদে বলিল, "এ দেশের কক্ষ হ'তে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আজ খসে পড়্লো! এ স্থান সহজে পূর্ণ হ'বে না।"

নীরদের বক্ষ হইতে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস সরিয়া গেল। সে বলিল, "নক্ষত্র বল্লে বলাইকে ছোট করা হয় মা! বলাইচাঁদ এ দেশের চাঁদই ছিল; সুস্নিগ্ধ আলোকে সে এতদিন দেশটাকে হাসিয়েছে! আজ পূর্ণিমা তিথিতে সে পূর্ণচন্দ্র চিরতরে অস্তমিত হল! তার অভাবে এ পোড়া দেশটা চিরকাল আঁধারেই কাটাবে!"

নীরদ ঘরে গিয়া দেখিল, বীণা বিষণ্ণবদনে বসিয়া কি ভাবিতেছে। নীরদ তাহাকে বলিল, "তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারো; আমি রাত্তিরে কিছুই খাবো না।"

বীণা বলিল, "বন্ধু-বিয়োগে খেতে নেই, তা জানি; আমিও খাবো না।"

নীরদ মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি খেতে পারো।"

"বলাইবাবু কি শুধু তোমারি বন্ধু? তিনি ছিলেন দেশ-বন্ধু; সে হিসাবে আমাদের সকলেরই বন্ধু। তা ছাড়া সহধর্ম্মিণীর উচিত, —স্বামীর আচার-আচরণ পালন করা।" শোককাতরকণ্ঠে বীণা এ কথা কয়টী বলিল।

নবপ্রতিষ্ঠিত দোকানের হিসাব-নিকাশ করিয়া রাত্রি দশটার পর ভুবন বাড়ী গেল এবং মনোরমা বাড়ী ফিরিয়াছে কি না, আগে তাহার খবর লইল। তারপর মনোরমার শুইবার ঘরে গিয়া দেখিল, সে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুইয়া আছে। ভুবন মনে করিল, মনোরমা ঘুমাইয়াছে, সুতরাং তাহাকে জাগাইল না। কিন্তু আহারের জন্য বামুন-ঠাকুর ডাকিলেও যখন সে উঠিল না, তখন বাস্তবিকই ভুবন চিন্তিত হইল এবং স্বয়ং তাহার সংবাদ জানিতে গেল। অনেক ডাকাডাকির পর মনোরমা সহজ সুরেই বলিল, "আমার শরীর আজ ভাল নেই,—বিরক্ত করো না।"

ভুবন খুব উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ, শুন্‌তে পারি কি?" মনোরমা মৃদু ভাবে বলিল, "মর্‌বার মত কিছুই নয়,—চিন্তার কারণ নেই।"

ভুবন এ কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "সেকি! আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুন্‌ছি?—পাগলামি কেন?"

মনোরমা আর কোন কথাই বলিল না, দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল। এ দিন হইতে পতি-পত্নীর মধ্যে বেশ একটু দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল; দ্বন্দ্বটা অবশ্য চলিতে লাগিল উভয়ের মনে মনে।

২১

দেশের নানা কাজেই বলাই নীরদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপে খাটিয়া আসিতেছিল। বলাইয়ের মত দক্ষকর্ম্মীর সাহায্য পাওয়াতেই নীরদ সকল বিষয় সফল করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল। তাহার বিয়োগে নীরদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, আশা-ভরসা কমিল, উৎসাহ-উদ্যম লুপ্ত হইল। সুতরাং সে আর আগের মতন মন দিয়া কোন কাজই করিতে পারিল না; ফলে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কোন নূতন বিষয়ে আর হাত দেওয়া হইল না, আরব্ধ কার্য্যগুলিও অচল হইয়া উঠিল।

শুধু বাহিরের কাজে নয়, ঘরে গিয়াও নীরদ অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার ঘরের শান্তি বেশী পরিমাণে লুপ্ত হইল আর একটী কারণে। বলাইয়ের মৃত্যুর পর তিনমাস যাইতে না যাইতেই তাহার স্নেহময়ী জননী তিনদিনের জ্বরে সংসারের সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া ইহধাম হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাতেই তাহার দুঃখের বোঝাটা আরও ভারী হইল এবং সে সংসারটাকে একেবারে অসার মনে করিতে লাগিল। বীণার কর্ম্ম-নৈপুণ্যে গৃহে শৃঙ্খলার ক্রটী নাই; তথাপি মাতৃগুণমুগ্ধ পুত্র গৃহটাকে শূন্য মনে করিতে লাগিল। মোটের উপর কি ঘরে, কি বাহিরে, কোথায়ও আর সে শান্তির বাতাস পাইল না।

স্বামীর মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বীণা সময় সময় চক্ষু মুছিত এবং স্বামীকে সুখী করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ কিছু হয় নাই, স্বামীর ঔদাসিন্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। তারপর বীণা মাধবীকে স্বামি-গৃহ হইতে আনাইয়া প্রায় তিন মাস বাড়ীতে রাখিল। মাধবী কনিষ্ঠা ভগিনী হইলেও খুব মায়া-মমতা দেখাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা-যত্ন করিতে লাগিল। বীণার উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া একদিন নীরদ তাহাকে বলিল, "মাধবী না হয় মায়ের স্থান পূর্ণ কর্‌লে, আর তুমি কর্‌লে বলায়ের স্থান; কিন্তু ভুবনের স্থান কে পূরণ কর্‌বে, বীণে?"

বীণা ক্ষোভে চঞ্চল হইয়া বলিল, "কেন, ভুবনবাবুর আবার কি হ'ল? তাঁর কোন অসুখ-বিশুখের কথা ত কখনো শুনি নি!"

"না, তার কোনো অসুখ করে নি। সে বুঝি পুরাণো প্রণয়ের শুষ্ক লতাটীকে আর সজীব হতে দিলে না! জীবনের ভাবী কর্ম্মপন্থার আলোচনা কর্‌বার কালে দেশ সেবার কল্পনায় একদিন আমাদের তিনবন্ধুর প্রাণেই পুণ্য প্রেমের ঢেউ লেগেছিল। হায়! নিষ্ঠুর নিয়তির দুর্নিবার আবর্ত্তে পতিত হ'য়ে আজ তারা বা গেল কোথায়, আর হতভাগ্য আমি বা রলাম্ কোথায়!"

সমবেদনায় বীণার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে কোনমতে আপনাকে একটু সামলাইয়া লইল; তারপর স্বামীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিল, "সে কি কথা! ভুবনবাবু ত তোমার চিরদিনকার বন্ধু;—আজ অমন কথা বল্‌ছো কেন?"

"আমার প্রতি তার অনুরাগ কম নয়, বটে, কিন্তু তা' কত মধুর হ'ত, যদি সে বলাইকে আপনার জান্‌ত!" ইহা বলিয়াই নীরদ একটী গভীর নিশ্বাস মোচন করিতে লাগিল।

বলাইয়ের শ্মশান-প্রাঙ্গনে মনোরমা স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া সেদিন তাহার স্বামী তাহাকে নিতান্ত কটু কর্ক্কশ ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিল এবং তাহা নীরদের কাণে গিয়াছিল। সেই হইতেই নীরদের মনের দুঃখ অত্যধিক হইয়াছিল এবং সে-জন্য পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতিতে আকুল হইয়া সে পত্নীর কাছে ভুবনের বিরুদ্ধে এ উক্তি করিয়াছিল। কিন্তু বীণা সে কথা জানে না, তাই স্বামীর মনের বেদনা কোনখানে ঠেকিয়া কতদূর গড়াইয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "সইই ত তোমার হাতে রয়েছে; সই মন কর্‌লে শুষ্ক লতা সতেজ হতে কতক্ষণ? ভাল, সই কি ভুবনবাবুর স্থান পূরণ কর্‌তে পার্‌বে না?"

নীরদ ক্ষোভকাতরকণ্ঠে বলিল, "তা হয় না বীণে,—তা হয় না! ভুবন কাজে নেমে পড়ে মন-প্রাণ ঢেলে দিলে যে ঢের বেশী কাজ হত; আমার সকল উদ্দেশ্যই সফল হ'ত! তোমার সয়ের প্রাণ আছে, কিন্তু কাজ কর্‌বার মত অবস্থা কৈ? তারপর তিনি বল্লেই বা ভুবন শুন্‌বে কেন, টাকা-পয়সা ত ভুবনেরই! তোমার সই যা দিতে চাচ্ছেন, তাই বা দিতে পার্‌ছেন কৈ!—তোমার সইকে পেতে যে এখনো ঢের দেরী!"

এদিকে বলাই লোকান্তরিত হওয়ায় শিল্পবিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার ভুবনের হাতে গিয়াছিল। তাহাতে তাহার স্বার্থ ষোল আনা; তাই সে খুব আগ্রহের সহিত সে কাজে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু শেষে বড় অনর্থ ঘটাইয়া বসিল।

ব্যাপারটা এই। ছাত্রদিগকে কাজে উৎসাহ দিবার জন্য বলাই জলপানির বরাদ্দটা মাঝে মাঝে বাড়াইয়া দিত এবং কাজ বেশী আদায় হইলেই পারিশ্রমিক বেশী দিত। এই রীতিটা রহিত করিবার জন্য ভুবন বলিল, শিক্ষার অবস্থায় যা কিছু দেওয়া যায়, তা-ই যথেষ্ট; কম পাইলেও ছাত্রদের আপত্তি করা উচিত নয়। ফলে ছাত্রগণ আর তেমন মন দিয়া কাজ করিল না, তাহাতে শিল্পদ্রব্য কম প্রস্তুত হইতে লাগিল। অবশেষে ভুবনের কড়া ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অনেকেই কাজ ছাড়িয়া দিল। মোট কথা, বলাইয়ের নিঃস্বার্থ পরিচালিত এবং নীরদের সযত্ন প্রতিষ্ঠিত কাজটা তাহাদের বন্ধু ভুবনের অন্যায় আচরণে পণ্ড হইবার উপক্রম হইল।

ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া একদিন অপরাহ্নে মনোরমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাজারের কারবারটা চল্‌ছে কেমন? লাভ হচ্ছে ত?"

ভুবন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিল, "লাভ এখন আর হচ্ছে কৈ? গেল ক'মাস ধরে দিন দিনই আয় কম্‌ছে।"

স্বামীকে তিরস্কার না করুক, অনুযোগ দিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াও মনোরমা তাহা করিল না; কারণ সে নীরদের কথার খোঁচা খাইয়া এখন সহ্য করিতে শিখিয়াছে। সে বিনীতভাবে

শুধু বলিল, "আগে ত আয় বেশ বাড়্ছিল, এখন কম্‌ছে কেন!"

মনোরমা জিজ্ঞাসু না হইলেও ভুবন তাহাই মনে করিল এবং উত্তরে বলিল, "এখন ছেলেগুলো আর মন দিয়ে কাজ কর্‌ছে না, নীরদ-দারও স্কুলের প্রতি আর তেমন প্রাণের টান নেই, কাজ ছেড়ে দিতে চাচ্ছে। কাজেই ওঁরা……"

স্বামীকে বলিতে বাধা দিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কাজ ছাড়্বেন কেন?"

"সে নাকি কয়দিন কলকাতা গিয়ে থাক্‌বে, পরে দেশ-ভ্রমণে কোথাও যাবে।"

"তিনি কাজ ছাড়্লে হেড্‌মাষ্টার কে হবেন? তোমার সে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে না কি?"

"তা এখনো ঠিক বলা যায় না; দরখাস্ত পড়েছে অনেক। তবে আমিও ছাড়্ছি নে;—শেষ পর্য্যন্ত দেখে নেব।"

"কমিটির মত কিরূপ?"

"কমিটী ত নীরদ-দাকে ছেড়েই দিতে চাচ্ছে না; নীরদ-দা বহুদিন যাবত কাজ করে আস্‌ছে কিনা, তাই। কমিটীর অনেকেরই মত হচ্ছে, ছ'মাসের জন্য নীরদ-দাকে ছুটী দিয়ে চন্দ্রকুমারের হাতে সম্প্রতি কাজের ভার রাখ্‌তে।"

"তোমার দরখাস্তটা বুঝি কমিটী মঞ্জুর কর্‌লে না?"

"কমিটীতে ত আমিও। যাতে সুবিধে হবে, তাই করা হচ্ছে কিনা। চন্দ্রকুমার অনেক দিন থেকে নীরদ-দার সহকারী-

স্বরূপে কাজ করে আস্‌ছে, তাই তার দাবীই নাকি সর্ব্বোপরি।

স্বামীর এলো-মেলো কথাগুলি শুনিয়াই ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, মনোরমা তাহা বুঝিয়া লইল। এখন সে-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া পুনর্ব্বার শিল্পকার্য্যের কথা পাড়িবার জন্য সে বলিল, "তোমার শিল্প-বিভাগের জন্য আর নতুন কোনো ব্যবস্থা হবে না ত ?"

"সেটা আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না ; ওটা আমার হাতছাড়া হলে ভয়ঙ্কর ক্ষতির কথা। কমিটী চাচ্ছে, তা মোহন কিম্বা অনিলের হাতে রাখ্‌তে। আমি তাতে প্রতিবাদ করেছি ; তাই তা স্থগিত রয়েছে।"

"এ সম্বন্ধে নীরদবাবু কি বলেন ?"

"নীরদ-দার সে পোঁ-ধরা কথা। সে বল্‌ছে, মোহনের হাতে থাক্।"

"আমার একটা কথা রাখ্‌বে ?"

"কি, বলো না,—শুনি।"

"রাখ্‌বে কি না, আগে বলো।"

"রাখ্‌বার মত হ'লে তা রাখ্‌বো না কেন ? বলো না,—খুলে।"

"আমি গেল ক'মাস ধরে মন্দ জ্বরে ভুগ্‌ছি, তা জানো ত ; মনটাও বড় খারাপ। বাবা বল্‌ছেন, হাওয়া পরিবর্ত্তন না কর্‌লে সহজে সার্‌বে না। তাই ভেবেছি, একবার পুরীতে যাবো।

সেখানকার সমুদ্রের হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর। তুমি আমায় সেখানে নিয়ে চলো।"

"সর্ব্বনাশ! এখন স্থানান্তরে গেলে যে কারবারটা ছাড়েখারে যাবে! স্কুলের কাজইবা দেখ্‌বে কে?"

"যে কারবারে লোকসান বই লাভ হয় না, সে কারবার তুলে দেয়াই ত ভালো। স্কুলের কাজ দেখ্‌বারও লোকের কিছু অভাব হবে না।"

"তা না হোক্, হেড্‌মাষ্টারের কাজটা কোন মতে হাতে আন্‌তে পার্‌লে যে একটা স্থায়ী আয়ের পথ হবে, তা কি একবার ভেবে দেখেছো?"

"তা না পার্‌লেও তেমন কিছু ক্ষেতি নেই, পরমেশ্বরের কৃপায় ও আয় ছাড়াও তোমার চল্‌বে।"

"হায় অদৃষ্ট! আয় বেশী হওয়ার নামই উন্নতি, এ সহজ কথাটাও তোমায় বোঝাতে হচ্ছে! তা ছাড়া হেড্-মাষ্টারের পদের কদর কত, তাও বোধ হয়, তোমার জানা নেই।"

এবার মনোরমা নিরীহ ভাল মানুষটীর মত উত্তর না দিয়া স্বামীকে একটু কড়া কথা শুনাইল; বলিল, "এমন উচ্চ আদর্শের কথা পাড়াগাঁয়ের একটা নগণ্য বোকা মেয়ে কি করে জান্‌বে, বলো। আর ও জানায় আমার লাভ বা কি? যে কথায় দ্বন্দ্ব-দ্বেষের বিষ ছড়ায়ে পড়ে—রেষারেষির ভাব ফুটে ওঠে, তেমন কথায় কাণ না দেয়াই তো ভালো।"

ভুবন মুখ ভারী করিয়া বলিল, "তা হ'লে আমার কথাই ধরো,—এখন পুরী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করো।"

"আমার অসুখ হয়েছে বলেই আজ তুমি উপেক্ষা কর্‌ছো; কিন্তু তোমার হলে কি কর্‌তে,—শুনি?"

"তোমার অসুখকে উপেক্ষা কর্‌বো কেন? আগে বাড়ী রেখেই চিকিৎসা করাবো, সহর থেকে ডাক্তার আনাবো। আমার মনে হয় তাতেই সার্‌বে।"

"পুরী গেলে আর একটা উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তীর্থ-ক্ষেত্রে হিন্দুরা ধর্ম্ম উদ্দেশ্যেও ত যেয়ে থাকে। তাতে মন ভালো থাকে।"

"এখন কটা দিনের জন্য এ সঙ্কল্পটা ছেড়ে দাও, আমি কারবারটাকে একটু গড়ে তুলি। তারপরে যেখানে যেতে হয় যেও।"

মনোরমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তা হলে আমার আর একটা প্রার্থনা শুন্‌বে?"

"আবার তোমার কি প্রার্থনা বাকী র'ল?—বলোনা, শুনি।" বলিয়া ভুবন বিস্ময়-বিরক্তির দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে চাহিল।

মনোরমা তখন এক হাতে আর এক হাতের বালাটা ঘুরাইল; পরে উহাকে শাঁখার গায়ে মিশাইয়া একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর অক্ষি-পল্লব নত করিয়া নম্রভাবে বলিল, "শিল্প-বিভাগের কাজটা মোহনের হাতেই ছেড়ে দাও।"

"তাতে তোমার লাভ?"—ভুবন রুষ্ট হইয়া ইহা বলিল।

মনোরমা বেদনা-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"লাভ আমার প্রচুর। তোমার লাভ হলেই ত আমার লাভ।"

"ভেবে দেখা যাবে।" বলিয়াই ভুবন প্রস্থান করিল।

কয়েকদিন আগ হইতেই ভুবন লক্ষ্য করিতেছিল, মনোরমার শরীরের ধাতটা যেন বদলাইয়া গিয়াছে; মনটাও আগের মত নয়—সে হাসিখুসীভাব আর নাই। আগের মত সে কথায় কথায় তর্ক জুড়িয়া দেয় না, খুটিনাটি ধরিয়া কোন্দল বাধায় না, নিজের কথা উপরে রাখিতে অত্যধিক জেদ করে না, রূপ-গুণের বড়াই করিয়া অন্যকে তুচ্ছ ভাবে না, ধন-জনের অভাব নাই বলিয়া গর্ব্বে স্ফীত হয় না, মূল্যবান বসন-ভূষণে আগ্রহ প্রকাশ করে না, অযথা রঙ্গ-রহস্যে ও অনুরাগ দেখায় না। দিন দিন বদলাইয়া এমনি ভাবে মনোরমাকে নূতন হইতে দেখিলেও ভুবন কোন দিনই উহা তেমন গুরুতর মনে করে নাই; কারণ তাহার মনটা বড় হাল্‌কা, গভীরভাবে ভাবিবার স্বভাব তাহার নয়। আজ মনোরমার সাদাসিধা আলাপে এবং শান্ত নম্র ব্যবহারে ভুবন বড়ই বিস্মিত হইল এবং পথে যাইতে যাইতে ঐ কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিল।

তারপর একদিন যখন মনোরমা সত্য সত্যই পাচক ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া নিজে রান্না করিতে গেল, তখন ভুবনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আহার করিবার কালে চচ্চড়ী মুখে দিয়া সে ব্যঙ্গ-ভরা সুরে বলিল, "নতুন রাঁধুণী তরকারী বেজায় কটু করতে পটু।"

মনোরমা প্রফুল্ল হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "নুন বুঝি তবে কিছু বেশী পড়েছে? আচ্ছা আবার না হয় কম করে দেয়া যাবে, মোটের উপর লোকসানের ভয় নেই!"

লোকসানের কথায় কারবারের কথাটা ভুবনের মনে পড়িয়া গেল। সে খুব গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "আমার কারবারে কিন্তু এখন আর মোটেই ক্ষতি হচ্ছে না।"

মনোরমা মুখের হাসি চাপা দিয়া বলিল, "শিল্পের কাজটা এখন দেখ্‌ছেন কে?"

ভুবন বলিল, "মোহনের হাতেই তা ছেড়ে দেওয়া গেছে।"

"ভাল, তবু আমার একটা প্রার্থনা রয়েছে;" বলিয়াই মনোরমা ঘরের বাহিরে গেল। ইত্যবসরে তাহার স্বামী আহারে খুব মনঃসংযোগ করিল এবং বোধ হয় ইহাই ভাবিতে লাগিল যে, এ ব্যবস্থাটা স্থায়ী হইলেই হয়,—এতে যে কম করিয়া ধরিলেও মাসে পনরটা টাকা বাঁচিতে পারে।

পতিপত্নীর মনোমালিন্যটা ক্রমশঃ বেশ একটু জমাট বাধিয়াই উঠিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে অন্য দশ দম্পতির মত ঝগড়াঝাটি কান্না-কাটির লেশ নাই;—নিত্যকার কাজ-কর্ম্মগুলি যেভাবে চলিতেছিল, তাহাতে দেখাইতেছিল যেন উভয়ের প্রাণ সত্যকার সখ্যতায় ভরপূর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিদারুণ দাব-দাহ চলিতেছিল; বিশেষতঃ মনোরমার পক্ষে উহা অসহ্য ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল, ঠিক যেন মোহন মাধুর্য্যে আচ্ছাদিত উৎকট ঐশ্বর্য্য!

২২

যেদিন নীরদ নন্দনপুর স্কুলের ছাত্রদের দর বিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল, সেদিন তাহারও চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়াছিল। সে গৃহে ফিরিলে তাহার ছল-ছল আঁখি দুটী ও মলিন মুখখানি দেখিয়াই বীণা বুঝিতে পারিল, কিরূপ প্রচণ্ড বাত্যা তাহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বীণার চিত্তও পতিবিরহ আশঙ্কায় কম অধীর হয় নাই। তথাপি আপন মনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি জোর করিয়া সরাইয়া রাখিয়া স্বামীর মনঃকষ্টের ভার লঘু করিবার জন্য বীণা বীণাবিনিন্দিতস্বরে বলিল, "কালই তুমি কল্‌কাতা যাবে, সে কথাটা আমায় স্পষ্ট করে বল্লে ক্ষেতি ছিল কি? সঙ্গে যা কিছু জিনিষ-পত্তর যাবে, তাও ত গুছিয়ে রাখ্‌তে হ'বে।"

প্রাণপ্রতিম ছাত্রগণের কোমল হৃদয়ের করুণ উচ্ছ্বাসের স্মৃতি তখনও নীরদের চিত্তকে আলোড়িত করিতেছিল। সে এক প্রকার অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর করিল, "আমি আস্‌ছে সোমবার বাড়ী থেকে যাবো, কতবার বলেছি ;—তুমি শুনেও শুন্‌বে না, আমি তার কি কর্‌বো? জিনিষ-পত্তর ত সঙ্গে যাবে বিস্তর, তা গুছাতে লাগ্‌বে দিন তিনেক।"

স্বামীকে অনুযোগ করিবার সুযোগ পাইয়া বীণা রোষের ছলে বলিল, "আমাকে ভালো করে বল্লে, বুঝি তা শুন্‌তাম না। তুমি কল্‌কাতা যাবে, তা কখখনি নিশ্চয় করে বল নি। তোমার সঙ্গে সেখানে গেলে এ সুযোগে গঙ্গায় একটা ডুব দেবার সৌভাগ্য ঘট্‌বে বলেও ত আমার তা' মনে থাকৃত।"

বীণার কথায় এবার নীরদের জড়তা ভাঙ্গিল। পাছে সঙ্গে যাইতে সরলা বীণা জেদ করিয়া বসে, সে আশঙ্কা এখন তাহার মনে উদিত হইল। এদিকে বীণাকে কখন কি বলা হইয়াছে, কলিকাতায় যাইবার কথা আদৌ বলা হইয়াছে কি না, তাহাও ভালরূপে তাহার মনে আসিল না। তাই সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমাকে কল্‌কাতা যাবার কথাটা বলাও যে বিপজ্জনক। যে সময়ে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়, সে সময়েই যাবার জন্য তোমার ইচ্ছাটা হচ্ছে বেশী। এও ত না বল্‌বার একটা কারণ হতে পারে। আর শুন বীণে!—তোমার এখনো গঙ্গা-স্নানের সময় হয় নি। আগে হৃদয়ের সঞ্চিত মালিন্যরাশি ধুয়ে মুছে ফেলো, যেন গঙ্গার পুণ্য সলিলে অবগাহন করে উঠেই জগৎকে নূতন আলোকে দেখ্‌তে পারো এবং আর কখনো সংসারের ধুলা-ময়লায় তোমাকে স্পর্শ কর্‌তে না পারে। তখন গঙ্গাস্নান কর্‌লেই ঠিক হবে,—অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে।"

বীণা মৌনী হইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তারপর দুঃখিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "তুমি সঙ্গে না নিলে জোর করে ত আর আমি যেতে পার্‌বো না; তবে না বলে যাওয়াটাই বা তোমার

পক্ষে উচিত হচ্ছে কিসে ? আচ্ছা, এখন আমার সেখানে যাওয়া উচিত নয় কেন, শুনতে পারি কি ?"

"আমি কেন কলকাতা যাচ্ছি, তা তুমি জানো ?"

"না বল্লে কি করে জান্‌বো ? আমি জান্‌লে পাছে কোনো বিপদ ঘটে, সে জন্যই তো তুমি জানাচ্ছ না, আমিও জান্‌তে চাই নে।"

"অর্থাৎ আমি তোমাকে জানিয়ে যাবো না, এই ঠিক্ বুঝেছ ?"

"যাবার সময় জানিয়ে যাওয়া এক কথা, আগে বলে খুসী করে যাওয়া আর এক কথা। আমি না জান্‌লেও ত কিছু ক্ষেতি নেই তোমার।"

"হতে পারে আমার ক্রুটী,—আমি কাজের ঝঞ্ঝাটে তোমাকে আগে বেশ করে জানাতে পারি নি। তুমি যে তা এম্‌নি করে ধরে বস্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আমি কলকাতা যাচ্ছি কিছু শিখ্‌বার জন্য ; সে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে সেখানে ঘুর্‌তে হবে, সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক্‌তে হবে। তুমি সঙ্গে থাক্‌লে কাজের ব্যাঘাত হতে পারে, সেজন্যই তোমাকে এখন সঙ্গে নেবো না, মনে করেছি।"

"অর্থাৎ আমি তোমার কাজে বাধা দেবো, এ ধারণাটা তোমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে !"

"তা নয়, বীণে !—তা নয় ; অমন উল্টো করে ধরো না। এ কথাটাই বল্‌তে চাচ্ছি যে, আমি কলকাতায় যে সংসর্গে বাস কর্‌তে যাচ্ছি, সে সংসর্গে বাস করা এখন তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।" বলিয়াই নীরদ শান্ত দৃষ্টিতে বীণার মুখের দিকে চাহিল।

বীণা সবিনয়ে বলিল, "সৎ সংসর্গে বাস সকল সময়েই বাঞ্ছনীয়। যাক্, তোমার অমতে আর কিছু আমি সঙ্গে যাবো না। তোমার সঙ্গে কি কি জিনিষ যাবে, এখন শুন্‌তে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই পারো। খালি বিছানা, ট্রাঙ্ক আর ঘটাটা।"

"টাকার কাজ চল্‌বে কি করে ? বাড়ীর খরচা না হয় ঠাকুর-পো চালাবেন, তোমার সেখানকার খরচের টাকা আস্‌বে কোথা হ'তে ?"

"তারো বন্দোবস্ত হয়েছে ; ভুবন একশ টাকা ধার দিয়েছে।"

"একশ টাকা ভুবনবাবু ধার দিলেন! তুমি আমাকে গোপন কর্‌ছো কেন ?—টাকা তা হলে সইই দিয়েছে। একশ টাকা সুদে না খাটায়ে ধার দেবার মত মন ভুবনবাবুর নয়,—বন্ধু-বান্ধবে চেলেও নয়!"

"কিন্তু সে তার একটা কাজ গুছিয়ে নেবার জন্যই দিয়েছে।"

"সে কাজটা কি, শুন্‌তে পারি ?"

"সে টাকা হাতে দিয়েই বল্লে, দেখো ভাই, হেড্‌মাষ্টারের কাজটা তুমি যখন কর্‌বে না, তখন ওটা বন্ধুর হিতের জন্য হাতে রাখ্‌তে ভুলো না।"

"তা হলে তুমি ঘুষের টাকাগুলো অনায়াসে নিয়ে আস্‌লে ?" বীণা বিস্ময়ের ছলে নীরদকে এ প্রশ্ন করিল।

নীরদ বলিল, "এ প্রশ্নটা আমার মনে তখন তখনি উঠেছিল। কিন্তু টাকা ফিরিয়ে দিলে বন্ধুর মনঃকষ্ট হবে, সে জন্যই তা কর্‌তে পারি নি। তোমার সই কিন্তু ছাড়্‌লেন না, মুখের উপর জবাব দিলেন। তিনি বল্লেন, এ ত তা হলে ঘুষ দেয়াই হ'ল ; উনি এ

টাকা নেবেন কেন? ছ'মাস পরে কাজের অবস্থা কি হয়ে দাঁড়াবে, কমিটার মতই বা কিরূপ হবে, তা উনি আগে কি করে বল্‌বেন? উনি বিদেশে যাচ্ছেন বলে তিলমাত্র খেদ নেই, আপন স্বার্থের কথাটাই তোলা হচ্ছে সকলের আগে!"

বীণা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছ'মাস পরেও তুমি কাজ কর্‌বে না, তা ভুবনবাবু কি করে বুঝ্‌লেন?"

"তা ওর অনুমানের কথা। 'গরজ বড় বালাই'—এ চলিত কথাটা শুনেছ ত।"—বলিয়াই নীরদ মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

"তা হ'লে তুমি ছ'মাস পার না হ'তেই বাড়ী ফির্‌বে;—কেমন, সত্যি?" বীণা নম্রভাবে স্বামীকে এ প্রশ্ন করিল।

"হাঁ, ফির্‌বার সম্ভাবনা এর মধ্যেই। কিন্তু এও তোমাকে বল্‌ছি বীণে! আমি যে কাজে যাচ্ছি, তার সাফল্যের জন্য দরকার হ'লে, ছ'বছরেও না ফির্‌তে পারি।" ইহা বলিয়া নীরদ উদাসনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ বীণার মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে বলিল, "তুমি কি কাজে যাচ্ছ, সে কথাটা খুলে বল্‌তে কি কোনো বাধা আছে?"

"তোমাকে কিছু গোপন কর্‌বার নেই বীণে! আমরা দেশের কাজ কর্‌ছি বটে, কিন্তু তা ঠিক ঠিক হচ্ছে না—শিক্ষার অভাবে। সকল কাজই আগে শিক্ষা কর্‌তে হয়, তারপর কাজে নাম্‌তে হয়। তাই কিছু শিখ্‌বার জন্যই আমি কলকাতা যাচ্ছি। শিখ্‌তে যে ক'দিন লাগ্‌বে সেখানে কি অন্য স্থানে থাক্‌তে হবে।" বলিয়া নীরদ আবার অন্যমনস্ক হইল।

দেশের কাজের চেয়ে অন্য কিছু স্বামীর কাছে বড় নয়,তাহা বীণা জানে। তাই সে সম্বন্ধে তাহার প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না। স্বামীর ঔদাসিন্য কাটিয়া দিয়া শুধু নিজের কথায় মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই সে এখন আবার দেশের কাজের কথা পাড়িতে গিয়া বলিল, "সই ত জানে, তুমি দেশের কাজেই কল্‌কাতা যাচ্ছ। সে তার নিজ তহবিল থেকেও ত তোমাকে একশটা টাকা অনায়াসে দিতে পার্‌ত। দেশের কাজে ত সয়ের খুব উৎসাহ!"

"তা পার্‌লেও যে দেন্ নি, তারো কারণ অস্পষ্ট কিছুই নয়। প্রথমদিন আমাকে দেখ্‌তে এসে তিনি চারশ টাকা দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভুবনের মত না হওয়াতে তা দিতে পারেন নি। ভুবন বলেছিল, মাত্র বিশ বাইশ টাকা দিতে। কিন্তু তোমার সই তাতে বিরক্ত হয়ে শপথ করে বস্‌লেন; বল্লেন, তাঁর নিজের টাকা না হলে আর কাউকে কিছু দেবেন না।"

বীণা দুঃখিত হইয়া বলিল, "ওদের মনোমালিন্যটা ক্রমশঃ বাড়্‌তেই চল্‌লো; ভগবান জানেন, পরিণামে কি ঘট্‌বে।"

"তিনি যখন যা কিছু করেন, তাতেই শুভ হয়। মনোমালিন্যের মধ্য দিয়েই হয়ত ওরা মিলনের সূত্রটা খুঁজে পাবে এবং তা পেতে আর বেশী দেরী হবে বলেও ত মনে হচ্ছে না। তোমার সই রোজ রোজ কেমন বদ্‌লিয়ে যাচ্ছেন, তা লক্ষ্য করেছ কি? উনি হচ্ছেন স্পর্শ-মণি,—স্বামীকে নিশ্চয় সোনা করে তুল্‌বেন।" ইহা বলিয়াই নীরদ বাহিরের লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে উঠিয়া গেল। স্বামী চলিয়া গেলে বীণা সেখানে বসিয়া আজ অনেক কথা

ভাবিল এবং তাহার সখীর সহিত স্বামীর মিলনের সূত্রটা কতখানি সুদৃঢ় মনে মনে তাহার আলোচনা করিল; সখী নিজের চেয়ে কতটুকু বড় এবং নিজেই বা এমন অযোগ্য কিসে, তাহারও অনুসন্ধান করিল। সে আজ নিজের অযোগ্যতায় এতখানি ম্রিয়মাণ হইল যে, তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ এক ভীষণ অস্বাভাবিক দীনতার ছায়ায় নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল এবং তাহার ললাটের ঘর্ম্ম-বিন্দু গণ্ডদেশ বহিয়া ঝরিতে লাগিল। কতক্ষণ সে এইভাবে কাটাইল, নিজে কিছু টের পাইল না; প্রায় একঘণ্টার পর নীরদ আসিয়া ডাকিলে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন সে আকুল প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। নীরদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এতবেশী করে কি কিছু ভাবতে হয়!"

পরদিন নীরদ কলিকাতা যাত্রা করিবার ঘণ্টা দুই-আড়াই পূর্ব্বে মনোরমা নিজেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহাকে দেখিয়াই নীরদ হাসিয়া বলিল, "এসেছেন?—বেশ হলো। আপনি না আস্‌লে আমাকেই এখন আপনাদের বাড়ীতে ছুটতে হ'ত।"

মনোরমার অধরেও হাসির রেখা ফুটিল। সে বলিল, "আমি এসেই কি তবে আপনাকে বন্ধু-দর্শনে বাধা দিলাম? কিন্তু আমি এসেছি নিজ প্রয়োজনে। আপনি বন্ধুদর্শনে ক্ষান্ত হবেন কেন? 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ'—ইহা ত সত্য কথা!"

মনোরমার ব্যঙ্গবাক্যে নীরদ হো-হো শব্দে স্বাভাবিক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "আপনি খুব হাসাতে পারেন। আপনার কথাগুলো শুন্‌লে আপনা আপনি হাসি বের হয়ে পড়ে!"

"যা' হোক্, তবু যাবার দিন আপনাকে হাসালাম ; এ কথাটা মনে থাক্‌বে ত ? কলকাতা গিয়ে আপনার গিন্নীর মুখরা সইকে ভুল্‌বেন না ত ? আপনি কি জন্য যেতে চেয়েছিলেন, তা এখন শুন্‌তে পারি কি ?"—বলিয়াই মনোরমা মাথার মোটা কাপড়টা সামনের দিকে একটু টানিয়া দিয়া শান্ত দৃষ্টিতে নীরদের মুখের দিকে চাহিল।

"আপনার কর্ত্তার দেওয়া টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে। এখন আমার টাকার আর অভাব নেই, অনিল টাকা এনেছে।"

"আমিও তা'হলে সে জন্যই এসেছি। আপনি বন্ধু-বরের ঘুষের টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন, শুনে খুব খুশী হলাম। এই ধরুন, একশ' আপনাকে দিচ্ছি, আপনি নিজে গিয়েই ঘুষের টাকাগুলো ফেরত দিন।" ইহা বলিতে বলিতে মনোরমা অঞ্চলের বন্ধন খুলিয়া টাকা বাহির করিতে লাগিল।

নীরদ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি টাকা দিতে স্বামীর অনুমতি পেয়েছেন ?"

"আমার নিজের টাকা নিজে খরচ কর্‌বো, তার আবার অনুমতি কেন ?—অনুমতি নিবার মত অপর্য্যাপ্ত সময়ই বা কোথায় ?"

"এ টাকাগুলো ত ভুবনেরই দেওয়া, আপনি নিজে আর কিছু উপার্জ্জন করেন নি।" বলিয়াই নীরদ নিজের রসিকতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার উচ্চ হাস্যে কক্ষটা পরিপূর্ণ করিল।

"এ টাকা আমার নিজেরি, মনে কর্‌তে পারেন। ইহা বাবার দেওয়া ; একটু আগে তিনি পাঠিয়েছেন।"—বলিয়া মনোরমা টাকা একশ নীরদের সামনে দিতে অগ্রসর হইল।

নীরদ বাধা দিয়া বলিল, "না—না; এখন ত আর আমার টাকার দরকার নেই! আমি আগের একশ টাকাই ফিরিয়ে দেবো।"

"আচ্ছা, তা হলে আমার একটা প্রার্থনা রাখ্‌বেন?" বলিয়া মনোরমা নীরদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকাইল।

"আপনার কথা শুন্‌বো, আবার প্রার্থনা কেন?—বলুন না। আপনার কথাগুলো শুন্‌তে যে ভারি মিষ্টি লাগে!" ইহা বলিতে বলিতে ঈষৎ হাসিয়া নীরদ মনোরমার মুখের দিকে চাহিল।

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "সয়ের কথার চেয়ে আর বেশী মিষ্টি নয়! তা মনে করাও উচিত নয়। আমার প্রার্থনাটা হ'ল এই,—আপনি কলকাতা গিয়েই আমাকে অবশ্য ঠিকানাটা জানাবেন; বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে জানাতে হবে।"

নীরদ এ কথায় বড়ই বিস্মিত হইল; বলিল, "সে কি! টেলিগ্রাম কেন? সেখানে গিয়েই চিঠি দিয়ে জানালে চল্‌বে না?"

"না, তা চল্‌বে না; চিঠি হয়ত আমার হাতেই পৌঁছাবে না। জানেন ত, সমিতির তরফ থেকে আমাকে যে যে চিঠি দেয়া হয়, তা সব সময় আমার হাতে আসে না। আপনার দেয়া চিঠিও যে ওরূপ হ'বে না, তার ত কিছু নিশ্চয়তা নেই।"

নীরদ আবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আপনার পেছনে ত দেখ্‌ছি, গোয়েন্দা লেগেই রয়েছে!—বড়া মুস্কিলকা বাত্‌ হ্যায়।"

মনোরমা এবার গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি বিপ্লবকারিণী কি না; তাই বড্ড কড়াকড় নজর!"

মনোরমা চলিয়া গেলে বীণা ধীরে ধীরে একটী স্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহাতে সে দুঃসহ পতি-বিচ্ছেদ ক্লেশও কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হইয়া গেল।

২৩

স্বামীর চিঠিতে ভাবিবার ও বুঝিবার অনেক বিষয় থাকিত; তাই ঐ গুলির আলোচনার জন্য বীণা মাঝে মাঝে মনোরমার কাছে যাইত। একদিন অপরাহ্ণে সে মনোরমার পড়িবার ঘরে বসিয়া নতমস্তকে একখানা পুস্তক পড়িতেছিল; এমন সময় ভুবন সে ঘরে ঢুকিয়াই বীণার পিছন হইতে হাতের খাতাটা ধপ্ করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "এই নেও তোমার হিসাবের খাতা। গেল মাসের হিসাবে ভুল আছে কি না, নিজেই পরীক্ষা করো।"

ইহাতে বীণা কিঞ্চিৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথার কাপড় সামের দিকে খানিকটা টানিয়া দিল, কিন্তু মাথা উঠাইয়া ভুবনের দিকে চাহিল না, পুস্তকের দিকেই পূর্ব্ববৎ দৃষ্টিস্থাপন করিয়া রহিল। ভুবন বীণার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া আবেগের ভরে নিজেই খাতাটা খুলিল এবং কয়েকটী পাতা উল্টাইয়া সরোষে বীণার মাথার কাপড়টা বাঁ হাতে পিছনের দিকে টানিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখন ন্যাকামি ছাড়ো; এই দেখো গেল মাসের হিসাবের জের। সে

মাসের লাভ যে দু'শ তিন টাকা তের আনা ছ পাই, তা'ত তুমি সকাল বেলায় বিশ্বাসই কর্‌তে পার নি। এখন নিজের চোখে ভালো করে দেখো।"

বীণা লজ্জা-রঞ্জিত নেত্রদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিতেই তাহার মস্তক ভুবনের গণ্ডদেশে সজোরে এমন ভীষণ আঘাত করিল যে, বিষম বেদনায় অধীর হইয়া ভুবন গালটা রগড়াইতে লাগিল, আর বীণা ফিরিয়া কাতর দৃষ্টিতে অপরাধীর ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চারিচক্ষুর মিলন হইলে ভুবন জানিতে পারিল, যাহাকে সে হিসাব বুঝাইতেছিল, সে মনোরমা নহে, তাহার সখী বীণা। কিন্তু তাহার চক্ষু নামিল না; মুগ্ধনেত্রে বিশাললোচনা বীণার বিলোল দৃষ্টির জালে আজ আপনাকে আপনার অজ্ঞাতসারেই জড়াইয়া ফেলিল। বীণাও বুঝি আত্ম-সংবরণের শক্তি হারাইল; সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় অনিমেষ নয়নে ভুবনের চোখের দিকে চাহিতে চাহিতে অকাতরে আপনাকে প্রলোভনের ফাঁদে নিক্ষেপ করিল। দুই বিমুগ্ধ চিত্ত পরস্পরকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিল; শেষে বীণারই জয় হইল। ফলে ভুবনের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, মাথটাও ঘুরিতে লাগিল। সে রূপ-লাবণ্যময়ী বীণার কোমলাঙ্গের আকর্ষণে চুম্বক কর্তৃক লৌহের মতন আকৃষ্ট হইল এবং তাহার গ্রীবাদেশে হস্ত স্থাপন করিবামাত্র বীণা একটু পিছনে সরিতে গা ঝাড়া দিয়া বলিল, "এ কি কচ্ছেন আপনি? আমাকে একেলা পেয়ে এমন অপমান কর্‌বেন?"

বীণা সরিতে চাহিয়াও সরিল না, পরন্তু বিলোল দৃষ্টিপাতে ভুবনকে একান্ত বিহ্বল করিয়া তুলিল, যেন পরাজিত বিপক্ষকে মরমে মারিয়া ফেলিতে চাহিল। তখন উন্মত্তচিত্ত ভুবনের তৃষিত ওষ্ঠ বীণার সরস সুরঞ্জিত অধরটা স্পর্শ করিতে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; তাহাতে বীণা নিদারুণ আশঙ্কায় ও বিষম লজ্জায় শিহরিয়া শির নত করিল এবং যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া ভুবনের অবশ হস্তের মুষ্টিবেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। তারপর বীণা অনেকখানি পিছনে সরিয়া গিয়া বিনয়ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তা হলে আর আমি আপনার বাড়ীতে মোটেই আস্‌বো না। আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে বিশ্বাস করে আস্‌ছি, আর আপনি অবহেলায় সে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ কর্‌ছেন!"

ভুবন ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমি—আমি—আমার দোষ হ'ল কিসে? আপনি এম্‌নি ভাবে চেয়ে থাকেন কেন? আজ আমি আপনার হাতের পুতুল। আপনি…" ভুবনের বাক্য সমাপ্ত হইল না, বাহিরে পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তস্করের মতন চুপে চুপে অপর দ্বার দিয়া সে সে-কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে বীণাও তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় গায়ে টানিয়া দিয়া সহজভাবে চেয়ারের উপর বসিল।

মনোরমা ঘরে ঢুকিয়াই বীণার দিকে চাহিয়া বলিল, "আস্‌তে আমার একটু দেরী হ'ল ভাই; রাগ কর নি ত?"

বীণা নতনয়নে মাথা নাড়িয়া খোলা পুস্তকটার দিকে চাহিয়া রহিল। তখনও তাহার চিত্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই; সুতরাং সে

মুখে মনোরমার কথার জবাব দেওয়া নিরাপদ মনে করিল না। তাহার পাশে আর একখানা চেয়ারে বসিয়া মনোরমা বলিল, "এ খাতাটা এখানে কে আন্‌লো ভাই?—এটা ত দোকানের খাতা।"

বীণা এবার ভগ্নকণ্ঠে সঙ্ক্ষেপতঃ উত্তর করিল, "ভুবনবাবু।"

মনোরমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কখন খাতাটা রেখে গেলেন?—কিছু বলেছেন কি?"

বীণা গলাটা ঝাড়িয়া অতি মৃদুভাবে বলিল, "একটু আগে খাতাটা রেখে গেছেন; কিছু বলেন নি।" বীণাকে এবার এক প্রকার মিথ্যা কথাই বলিতে হইল।

"দেখো ভাই, ওঁর রাগের দৌড়টা! সকালবেলা আমি বলেছিলাম, গেল মাসের হিসাবটা যেন আবার যাচাই করা হয়, গোমস্তা ভুল করেও বেশী আয় দেখাতে পারে। সেই রাগেই উনি এ বেলা খাতা নিয়ে এসেছেন। আমি যা ছল করে বলেছিলাম, তাই সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন। আজ কাল ওঁর মেজাজের ওজনই করা যায় না, সব বিষয়েই বড্ড বাড়াবাড়ি!" ইহা বলিয়াই মনোরমা কিঞ্চিৎ বিমনা হইল।

ক্ষণকাল পরে বীণা স্বরটা সহজ করিয়া লইয়া বলিল, "ব্যাপার কি? আজ কাল উনি এমন কর্‌ছেন কেন?"

"সে বিছ্‌ছিরি কথা শুনে তোমার দরকার নেই, ভাই। তা বলে আমারো লাভ নেই, মনের কষ্ট বাড়্‌বে মাত্র। পুরুষগুলো যেন ভাব্‌ছে, মেয়েমানুষে ওদের খেলার পুতুল আর ভোগের জিনিষ—সেবার সামগ্রী; ওরা যা বল্‌বে, তাই কর্‌তে হবে; নীতিকে কি

সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে চল্‌তে বল্লেও তা মাথা পেতে নিতে হবে, আপত্তি করা যাবে না। অবশ্য সব পুরুষের তেমন দুর্ম্মতি হয় না, আর সব মেয়েও আত্মসম্মান বজায় রেখে চল্‌তে জানে না; তাদের কথা আমি বল্‌ছিনে। তা ছাড়া অন্য পরিবারে যেরূপ কেলেঙ্কারী চল্‌ছে, তাই আমি লক্ষ্য কর্‌ছি।"

"তা হলে ভুবনবাবুর চরিত্রে আজকাল বেশ একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে; নয় কি? তা সত্য হলে ভাই, আমার আগেকার ধারণাটা বদ্‌লিয়ে দিতে হয়।" ইহা বলিয়াই বীণা মনোরমার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

"তোমার কিরূপ ধারণা ছিল, তুমিই জানো, ভাই। বদ্‌লাবে কিনা তারো কিছু জানি নে। থাক্ এখন সে কথা। আমাদের সমাজের এমন শোচনীয় দুর্দ্দশার কারণ কি, তার শেষ মীমাংসা সেদিন কিছুই হয় নি। আমি মনে কর্‌ছি, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় বঞ্চিত রেখেই সমাজ গোড়ায় একটা মস্ত ভুল করেছে এবং তার সংশোধন এখনো করে উঠ্‌তে পার্‌ছে না বলেই পদে পদে তার কুফল ভুগ্‌তে হচ্ছে। স্ত্রীজাতির অজ্ঞানান্ধকার দূর না হলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কখনি হতে পারে না। জ্ঞানের অভাবেই কুসংস্কারগুলো পরিপুষ্ট হয়ে থাকে, আর কতগুলো অন্ধ সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেই মুক্ত বাতাসের অভাবে আত্মা রুগ্ন হয়ে পড়ে।"

"মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে হবে, তুমি ত সর্ব্বদা বলে আস্‌ছ। তারা যদি দলে দলে কলেজে যায় আর পাশ করে পুরুষদের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা কর্‌তে কর্ম্মক্ষেত্রে নামে, তবে মেয়েদের করণীয় কাজ-গুলো করবে কে, বল দিকিনি ?”

“কলেজে পড়্‌লেই যে ভালো শিক্ষা পাওয়া যায়, আমি তা বল্‌ছিনে, ভাই। মেয়েরা কলেজে গিয়ে বরং আমাদের সমাজের বিরোধী কতগুলো কুশিক্ষাও পাচ্ছে, ছেলেরাও তার হাত থেকে মুক্ত নয়। তার ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব—জাতীয়তা হারাতে বসেছি। আমি উচ্চ শিক্ষার অর্থে সৎ শিক্ষা বুঝি,—যাতে লোকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝে চল্‌তে পারে, সহজ ও সরল পথে চলে জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টিদ্বারা আত্মগঠন কর্‌তে পারে ;—এক কথায় মানুষ হয়ে গড়ে উঠে।”

“তা হলে তোমার মতে এ দেশের স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শটা কিরূপ হওয়া উচিত ?”

“শুন তবে আর একটু বল্‌ছি। স্ত্রীজাতির অন্য কর্ত্তব্যের কথা ছেড়ে দিলেও ইহা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, এ দেশের স্ত্রী জননী, গৃহিণী আর সহধর্ম্মিণী। সুতরাং কিসে সন্তানের জীবন সুখময় হবে, কিসে গৃহের সুখ-সচ্ছলতা বাড়্‌বে, কিসে স্বামীর ধর্ম্মোন্নতি ঘট্‌বে, এ যদি কোনো মেয়েকে দেখ্‌তে হয়, তবে তার কতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করা দরকার, তা ভেবে দেখো একবার। এ দেশের মেয়েদের পক্ষে তেমন শিক্ষারই প্রয়োজন, যাতে তারা এ ত্রিবিধ কর্ত্তব্য পালন করে জীবন সার্থক কর্‌তে পারে। তারা আদর্শ জননী, আদর্শ গৃহিণী আর আদর্শ সহধর্ম্মিণী না হলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর নয়।”

"পুরুষদের সম্বন্ধেও ত সে কথা। তারা আদর্শ জনক, আদর্শ-গৃহকর্ত্তা আর আদর্শ ধর্ম্মনিষ্ঠ না হলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কি করে হবে? আমাদের সমাজের সব পুরুষ কি আর তেমন?" বীণা শেষের কথা কয়টা একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল।

"না—তেমন নয়, তা ঠিক। তোমার স্বামীর মতন আদর্শ স্বামী আমার নয়; তাই এ পরিবারের গলদ দূর হচ্ছে না। আবার সত্য কথা বল্‌তে গেলে তুমিও তোমার স্বামীর যোগ্যা নও; তাই তোমাদের পরিবারটাও আদর্শ স্থানীয় হচ্ছে না। সমাজকে উঠাতে হলে স্ত্রী-পুরুষকে সমভাবে—সমবেত শক্তিতে চেষ্টা কর্‌তে হবে; দেখ্‌তে হবে একের অবহেলা বা অজ্ঞতায় যেন অপরে পঙ্গু হয়ে না পড়ে। পরস্পরকে সাহায্য করে আদর্শ জীবন গঠন করাই ত দাম্পত্য মিলনের উদ্দেশ্য।"

বীণা বিমনা হইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল, তারপর সবিদ্রূপ বাক্যে বলিল, "তুমি ত ভাই, উচ্চ জ্ঞান-সম্পন্না আর আদর্শ স্থানীয়া; তুমি তোমার স্বামীকে গড়ে তোলো না কেন? কিন্তু ভাই, আমাকে গড়্‌বার কেউ নেই; যিনি গড়্‌বেন, আমি ত তাঁর উপেক্ষিতা। সে ভারটাও তোমার উপরই রাখ্‌তে চাচ্ছি,—অন্ততঃ কিছু কালের জন্য।"

"ভাই, আমার কোন গুণই নেই; আমার যা কিছু শিক্ষা নীরদ বাবুর নিকটে। আমাদের সকলকে গড়ে তুলে সমাজটাকে উন্নত কর্‌তে তাঁর মতন কর্ম্মীরই প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার আদর্শে জীবনটা গঠন কর্‌তে আমাদের ত চেষ্টা কর্‌তে হবে। তিনি পথ-

প্রদর্শক মাত্র ; আমাদের উচিত, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুসরণ করা, তাঁহার আদেশ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে চলা। আর তিনি তোমাকে উপেক্ষা কর্‌ছেন বলে মিথ্যা সন্দেহ কর্‌ছো কেন ভাই ? তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধেই এখন প্রবাসীর জীবন যাপন কর্‌ছেন। এটাও ত তাঁহার একটা অসাধারণ ত্যাগের কার্য্য।”

“আমার ত ভাই, প্রতিক্ষণ ভয় হচ্ছে, আমি বুঝি কোনদিনই তাঁকে অনুসরণ কর্‌তে পার্‌বো না। সে পিচ্ছিল পথে চল্‌তে গেলেই কেবল আছাড় পড়্‌বো ! তিনি টেনে নিতে চেলেও আমি ছুটে ছুটে পড়্‌বো, খালি পেছিয়েই যাবো।” নিদারুণ নিরাশার ছায়াপাতে বীণার বদন মলিন—একেবারে রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গেল।

“বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, এখনো তোমার মিথ্যা ভয় দূর হলো না। মনকে খাঁটি করো ; কাজে মন দৃঢ় হয়ে বস্‌লেই ভয়-ভাবনা দূরে ছুটে পালাবে, আশার আশ্বাসে প্রাণ উৎফুল্ল হবে। কেন তুমি এমন ভয় খাচ্ছ, তা টের পেয়েছ কি ? আমি কিন্তু তার একটা কারণ নির্দ্দেশ কর্‌তে পারি।” মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া শেষের কথা কয়টা বলিল।

“সে কারণটা কি ভাই, বলো না তবে,—শুনি।”

“তুমি তোমার ভয়ের কারণের খোঁজ নিজে রাখো না, আমাকে বল্‌তে হবে ? শুন তবে, বল্‌ছি। এতদিন আবরুর আড়ালে থেকে তুমি অকারণ কতগুলো মিথ্যা ভয়কে পোষণ করে আস্‌ছ। তোমার মনের মধ্যে সেগুলো এমনি দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে যে, কিছুতেই আর দূর কর্‌তে পার্‌ছ না। কিন্তু ওগুলোর মূলচ্ছেদ কর্‌তেই হবে।

তা'ছাড়া আরো দু'একটা কারণ আছে,—প্রায় সব মেয়েমানুষেই যার ফাঁদে পড়ে অনর্থক মনঃকষ্ট ভোগ করে থাকে। এককালে আমারো সে দুর্ভাগ্য ঘটেছিল।"

"তা' কি, বলো না—শুনি; ভাবতে হবে ত?"

"তা হচ্ছে, বেশভূষার দিকে বেশী করে নজর দেওয়া। মূল্যবান গহনা-গাটি আর ভাল কাপড়-চোপড় পর্‌বো, এ যদি কোনো মেয়ে-মানুষের লক্ষ্য হয়. তবে সে কেবল ও নিয়ে থাকতেই ভালবাসে, কাজের দিকে মন দিতে পারে না। এতে যেমন ভোগ-বিলাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে দেহে রোগের সৃষ্টি করে, তেমনি ব্যয়-বাহুল্যের ভারেও সংসারটাকে প্রপীড়িত করে তোলে। মধ্যবিত্ত পরিবার ত এ রোগে মারা যেতেই বসেছে! গহনা-গাটির লোভে চোর ডাকাতেরা আবার তার উপর দেশে আর একটা অশান্তি বাড়াচ্ছে!"

"বেশভূষায় মন থাকলে কাজের চেয়ে নিজের দিকেই বেশী নজর পড়ে, এ কথাটা না হয় মান্‌লাম; কিন্তু মেয়েমানুষে আবরুর বাহিরে গিয়ে কিরূপে যে ভাল কাজ করবে, তা ত বুঝলাম্ না। আর স্ত্রীলোক ত দুর্ব্বল জাতি, ঘরের বাহিরে গেলে বিপদের আশঙ্কাও ত কম নয়।"

"সব সময়েই এবং সব মেয়েকেই ঘরের বাহিরে যেতে হবে, আমি এ কথা বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছি, প্রয়োজন হলে যেতে শঙ্কা করা উচিত নয়। তা করলে কর্ত্তব্যের অবমাননা করা হয়। আর জেনো, যে যাবে, সে মনুষ্যত্ব নিয়ে ভালরূপে প্রস্তুত হয়েই বের হবে। পুরুষে আমাদের অবলা বল্‌লেও, বাস্তবিকই আর আমরা

সেরূপ নই ; আমরা মা-মহাশক্তির মেয়ে—অপরিসীম শক্তির আধার ! ব্রাহ্মী শক্তিদ্বারা আমরা সংসার-মরুতে নন্দন সৃষ্টি কর্ছি, বৈষ্ণবী শক্তিদ্বারা সংসারটা রক্ষণ-পোষণ কর্ছি, আর শঙ্করী শক্তি দ্বারা যা জীর্ণশীর্ণ, অযোগ্য অনুদার, পঙ্কিল পাপযুক্ত, তাকে ভেঙ্গে চূরে দিচ্ছি। এ ত্রিবিধ শক্তির খেলা দেখাতে কেবল আমরাই পারি, পুরুষেও তা পারে না। সুতরাং আমাদের শক্তি কত বড়, তা ভেবে দেখো। ঘরের বাহিরে গিয়ে তুমি আত্মরক্ষা কর্তে পার্বে কি না, ভাব্ছো ; কিন্তু মনে করো একবার, মা-মহাশক্তির হাতে যেমন বর আর অভয়, তেমনি তীক্ষ্ণ অসি আর ছিন্ন মুণ্ড। আমরা তেমন মার মেয়ে হয়ে পশুদলনে ভীত হবো ? আমাদের চোখে কেবল করুণার ধারা আর বেদনার অশ্রু বহাইলেই চল্বে না ভাই, প্রয়োজন হলে প্রলয়ের আগুন, ধ্বংসের বজ্রও ছুটাতে হবে।”

আত্মশক্তিতে মনোরমার কতখানি বিশ্বাস, তাহা জানিয়া বীণা কিছুক্ষণ বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে বলিল, “তোমার ভাই, অপরিমিত সাহস ; তাই এমন কথা মুখে আন্ছো। কার্য্যকালে কতদূর কি কর্তে পার্বে, এখুনি ঠিক বলা যায় না। আমার ত সন্দেহ মোটেই দূর হচ্ছে না ; ভাবতে গেলেই যেন ভয় এসে আমাকে কঠোর বেষ্টনে চেপে ধরে।”

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “বৌদ্ধদের মতে সন্দেহই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ পাপ। আমি ত আগেই বলেছি, ভাই, আবরুর আড়ালে—কোণঠাসা হয়ে থেকে তুমি এতদিন যে কুসংস্কারকে

সযত্নে পোষণ করে আস্‌ছ, তাকে এক মুহূর্ত্তে ধুয়ে-মুছে ফেল্‌তে পারবে না। এ মিথ্যা ভয়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে তোমার কিছুদিন লাগ্‌বে। কিন্তু মনে রেখো ভাই, ভয়ের মতন পাপ নেই, আর সাহসের মতন বন্ধু নেই। পাপকে ঝাটিয়ে দূর করে দিয়ে, আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতেই হবে।"

বীণা এদিন এখানেই বিদায় হইল। যাইবার কালে মনোরমার শেষ কথাটা প্রতিক্ষণ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বাড়ীতে গিয়াও তাহাকে সে কথা অনেকক্ষণ ভাবিতে হইল। ভয় যে কত বড় একটা পাপ, তাহা সে আজ নিজেই ভালরূপে টের পাইয়াছে এবং ভুবনের আচরণটা দেখিয়াও বুঝিতে পারিয়াছে।

ইহার তিন দিন পর বীণা রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইবার পূর্ব্বে তাহার ঘরের দরজাটা বন্ধ করিতে যাইতেছিল। হঠাৎ ভুবন সম্মুখে দেখা দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিতেই বীণা চমকিত হইয়া একটু পিছনে সরিল এবং "কি!—আপনি এমন অসময়ে!"—বলিতেই ভুবনকে মাতালের মত টলিতে টলিতে কাছে আসিতে দেখিয়া সে দ্রুতপদে বিছানার কাছে সরিয়া গেল এবং ছোরার মত ঝক্‌ঝকে কি একটা জিনিষ বা হাতে কাপড়ের মধ্যে লুকাইল; তারপর সে ফিরিয়া আসিয়া বসিবার জন্য ভুবনকে একখানা চারপায়া আগাইয়া দিল। ভুবন বসিল বটে, কিন্তু তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া বীণা অনায়াসে বুঝিল, তাহার মন নিতান্ত চঞ্চল; হয়ত সে মদ্য পান করিয়াই আসিয়াছে।

সেদিন মনোরমা তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিল, সে কথাটা বীণার মনে পড়িল এবং ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া তাহা চিন্তা করিল। অবশেষে সে-ই ভদ্রতার অনুরোধে নিস্তব্ধতাটা ভঙ্গ করিবার জন্য বলিল, "কিছুমাত্র সংবাদ না দিয়ে এভাবে হঠাৎ এসে হাজির হওয়া যে স্বপ্নেরো অগোচর! আমরা গরীব বলে এম্‌নি ভাবে উপেক্ষা করা কি আপনার উচিত?"

বীণার মিষ্ট অনুযোগে ভুবনের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল; সে ভাবের উচ্ছ্বাসে বলিতে লাগিল, "কে বল্‌লে, আপনাকে উপেক্ষা কর্‌ছি? আপনার মুখে অমন দৈন্যভরা কথা কেন? বলুন না, আপনার কত টাকার দরকার; এখ্‌খুনি আঁপনি পাবেন। আপনাকে আমি স্পষ্ট করেই বল্‌ছি এখন, আপনার যখন যা দরকার, তা বল্‌তে মাত্রও লজ্জা-সঙ্কোচ কর্‌বেন না। আমার যা কিছু ধনদৌলত তা আপনার জন্যই। আপনি অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, শুন্‌লে আমার অন্তরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়!"

ভুবনের কণ্ঠের জড়তা ও ভাষার শিথিলতা হইতে বীণা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার অভিপ্রায়টা নেহাত মন্দ। সে সবিনয়ে বলিল, "আপনি মনে কর্‌ছেন, টাকা-কড়ির অভাবে আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি; বস্তুতঃ তা নয়। ঠাকুরপো আজকাল দু-পয়সা রোজগার কর্‌ছেন,—এখন আমাদের দিন বেশ কেটে যাচ্ছে।"

"মিছে কথা! আমি বুঝি আর কিছু জানি নে। তা হ'লে আপনি সেদিন মনোরমার কাছে দশটাকা ধার চাইলেন কেন?" বলিয়াই ভুবন বীণার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিল।

বীণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "সই বুঝি তা আপনাকে বলেছে? তা অন্য একটা কাজের জন্য চেয়েছিলাম, সংসারের কোনো কাজের জন্য নয়।"

অর্দ্ধ-বিকশিত কমল-কলির ন্যায় বীণার অর্দ্ধহাস্যযুক্ত সুশোভন বদনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্ত ভুবনের মাথাটা সম্পূর্ণরূপে ঘুরিল এবং সে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। অমনি সে পকেট হইতে দু'গাছি নূতন বালা বাহির করিল এবং চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া খপ্ করিয়া বীণার ডানি হাতখানা ধরিল। তথাপি বীণা আজ মাত্রও জোর প্রকাশ করিল না; জোর করিয়া হাত ছাড়ানকে সে নেহাত হীনতা মনে করিল। কিন্তু সে চক্ষু লাল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ছি! ভুবনবাবু, আপনি কি আমাকে কচি খুকী ভাব্ছেন যে, হাতে মোয়া-মিছরী দিয়ে ভোলাবেন? এমন হীন ব্যবহার আপনার যোগ্য মোটেই নয়! আপনি এ সময়ে একেলা পাপচিত্তে এখানে ঢুকেই গুরুতর অপরাধের কাজ করেছেন, তার উপর আর কাপুরুষতার মাত্রা বাড়াতে যাবেন না। আপনি স্বামীর সুহৃদ্ বলেই আজ আমার হাতে নিষ্কৃতি পেলেন, অন্য কোনো লোক হলে আমি সে নর-পশুকে এখুনি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেখাতাম, আবশ্যক হলে আর্য্যনারী ইজ্জত বজায় রাখ্তে হাতে হাতিয়ার ধর্তে শঙ্কা করে না।" ইহা বলিয়াই বীণা বস্ত্রাভ্যান্তর হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। অমনি ভুবন তাহার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় তখন তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, অথবা ভীরুর হৃদয়ে মৃত্যুভয়ে যে

অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হওয়াও অসম্ভব কিছুই নয়। তথাপি সে এখন মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া রহিল না; তাহার চিত্ত অবশ, তাই সে আবার মুখটা সরস করিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু আজ আপনি স্বামীর সখাকে যেরূপ আদরের অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করলেন, এ জীবনে তা ভুলবার নয়।"

ভুবনের অনুযোগ-উক্তিতে বিনতা বীণা বাস্তবিকই লজ্জিত হইল এবং পানের ডিবাটী ভুবনের সাম্নে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আর একটা ছলে এখন ভুবন তাহার নির্লজ্জতা প্রকাশ করিতে চাহিল। সে চারপায়ার উপর বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মনোরমার সহিত নীরদের অবৈধ মিলনের দুই চারিটী অযথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া দিল। স্বামীর প্রতি বীণার অনুরক্তির লাঘব করাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার ফলে সে কোন দিন স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় তাহার নিকট প্রণয়িনীরূপে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে, ইহাই সে তখন ভাবিতেছিল। সে কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়াও বীণা কোনরূপ উত্তর করে নাই, কিন্তু ভুবন উঠিয়া গেলে তাহা ভাবিয়া স্বামীর প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষ তাহার অন্তঃকরণময় বিসর্পিত হইয়া উঠিল। সে নিদারুণ বেদনায় অবসন্ন হইয়া শয্যার উপর নিশ্চল নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, আর ভাবিতে লাগিল, 'ভুবনবাবুর কথাটা নিশ্চয়ই সত্য; তা না হলে কোন পুরুষে কি অপরের কাছে নিজের স্ত্রীর এমন একটা গুরুতর দোষের কথা মিছামিছি মুখে আনতে পারে?' সে রাত্রিতে নানা দুশ্চিন্তার তাড়নায় বীণার ভাল ঘুম হইল না।

পরে বীণার চরিত্রের এ পরিবর্ত্তনটা স্পষ্টরূপে ধরা পড়িল যে, সে আর আগের মত মন খুলিয়া সখীর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও আর যখন তখন ছুটিয়া যাইত না। বীণার এ অসঙ্গত ব্যবহারে মনোরমা মনে মনে বিষম চটিয়াছিল এবং নীরদকে সে সংবাদ জানাইয়া সখীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল।

২৪

কলিকাতা যাইবার পর পাঁচ মাস যাইতে না যাইতেই নীরদ প্রতিরোজ চারি পাঁচখানা করিয়া দেশের চিঠি পাইতে লাগিল। বীণা, অনিল, মোহন,মনোরমা,চন্দ্রকুমার দুই তিন দিন পর পরই চিঠি লিখিত; তা'ছাড়া স্কুলের সেক্রেটারী, ছাত্র-সঙ্ঘের সম্পাদক, দেশ-কর্ম্মিগণ এবং অন্য যুবকেরাও মাঝে মাঝে চিঠি দিত। এই পাঁচ মাসে ভুবন মাত্র তিনখানা চিঠি লিখিয়াছিল, কিন্তু ষষ্ঠ মাসে তাহার চিঠির সংখ্যা খুব বাড়িয়া গেল। এই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রায় প্রতিরোজই তাহার চিঠি পাওয়া যাইত। অন্যান্যের চিঠির মর্ম্ম—অগৌণে দেশে ফিরিয়া গিয়া হেড্মাষ্টারের পদ গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ; কিন্তু ভুবনের চিঠিতে তাহার উক্ত পদপ্রাপ্তির কথা ছাড়া আর বড় বেশী কিছু থাকিত না।

নীরদ এবার কলিকাতায় গিয়া মাত্র দুই সপ্তাহ তাহার আত্মীয় নারায়ণবাবুর বাসায় ছিল; তারপর সতীশবাবুর অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতেই উঠিয়া গেল। সতীশ বাবুই তাহার প্রধান উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। তিনি খুব সচ্চরিত্র; বয়স পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাপি বিবাহ করেন নাই। তিনি ধর্ম্মালোচনা ও দেশ-সেবাকেই জীবনের সার করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের যুবকদের সম্মুখে পুরুষত্বের পরম অবদানের একটা আদর্শ স্থাপন করিতে মনন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশেই কয়েকমাস পূর্ব্বে নীরদ ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সে-কথা দেশের সকলকে জানাইয়াছিল।

নীরদ সত্বর দেশে ফিরিবে না জানিয়া সকলের মনেই দুঃখ হইল; কিন্তু বেশী হইল ভুবনের মনে। কারণ সুযোগ সুবিধা ঘটিয়াও তাহার ভাগ্য ফলিল না, চন্দ্রকুমারই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেকাজে আরও ছ'মাসের জন্য বহাল রহিল। ইহাতে আনন্দিত হইয়া মনোরমা সঙ্ক্ষেপতঃ নীরদকে লিখিল, "এ ব্যবস্থাই উত্তম হইয়াছে; কারণ যাবতীয় কার্য্য চালাইবার জন্য চন্দ্রকুমার বাবুর চেয়ে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি এখন এদেশে নাই বলিলেই চলে। তিনি যেমন সরল, তেমনি সাধু; কর্ম্মেও বেশ নিপুণ। আপনার বন্ধু ত শুধু ঝোঁকের মুখেই কাজটা হাতে নিতে চান; কিন্তু তা করা কি ঠিক? ঈর্ষার বশে কি স্বার্থের মোহে কাজ করিতে যাওয়া ঘোর অনিষ্টকর।"

পুণ্য প্রেম

ছ'মাস অতীত হইলেও স্বামী বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া বীণা তাহাকে অনুযোগ সহকারে চিঠি লিখিল। তদুত্তরে নীরদ পত্নীকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিল ;—

"প্রিয় বীণা,

কাল তোমার চিঠিতে এবং আজ তোমার সখীর চিঠিতে সাধুচরিত্র ডাক্তার কেশববাবুর মৃত্যু সংবাদ জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং শেষ বয়সে চিকিৎসায়ও বেশ নাম করিয়াছিলেন। স্নেহময় পিতার মৃত্যুতে তোমার সখীর চিত্ত যে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। আজই তাঁহাকে সান্ত্বনা-সূচক চিঠি লিখিব।

এতদিন কাহাকেও যাহা বলা হয় নাই, তাহা সদাশয় কেশববাবুর মৃত্যুর পর শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আজ তোমাকে লিখিতেছি। তিনি দেশের কাজে সর্ব্বদা আমাকে উৎসাহিত করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন, নীরদবাবু, তুমি কেন্দ্রে থেকে দেশের কাজের যন্ত্রটাকে চালিয়ে দাও। সকলকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তেই হবে ; আজ হোক, কাল হোক্, তাদের পথে আস্‌তেই হ'বে!' আজ কেশববাবুর কথায় তোমার বাবাকেও মনে পড়িতেছে। তিনিও একদিন কর্ম্মের প্রেরণা দিবার জন্য বজ্রনাদে আমার কাণে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই আজ পর্য্যন্ত প্রাণের তারে তারে বাজিতেছে। তাহাই দৈববাণীর মত আমাকে কত ভয়-ভাবনার কবলে আশ্বাস প্রদান করিয়াছে, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির হস্ত হইতে কৌশলে রক্ষা করিয়াছে। সেই অভয়

বাণীটী এই—সত্যকে সার জানাই ধর্ম্মের মূল, এবং তাহাই জীবনের যথার্থ উন্নতির সোপান।”

তুমি লিখিয়াছ, ‘আমি দেশের কাজের কি বুঝি? কিরূপেই বা তা কর্‌বো?’ যখন জগন্নাথদেবের রথ চলে, তখন যার যতটুকু শক্তি, সে ততজোরেই টানে; বালকেও তাহার ক্ষুদ্র শক্তিটুকু ঢালিয়া দিয়া টানে; তবু টানে ত! ছোট বড়, সকল শক্তিগুলির সমবায়েই ত অত বড় রথটা চলে! তেমনি তুমি কি আমি যতটুকু বুঝি, যতটুকু পারি, ততটুকু করিতে থাকিব; তাহাতে কিছু না কিছু ফল হইবেই। নিরাশ হইও না; কাজে নামিলেই শক্তি আসে এবং সে শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে, বাহির হইতে আসে না। কিন্তু হৃদয়টাকে উৎসর্গ করিতে হইবে। আপনাকে বিলাইয়া দিয়া কাজ না করিলে সফলকাম হওয়া যায় না। এক সময় তোমাকে যাহাতে বারণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা করিতে বলিতেছি;—এখন সময় হইয়াছে। তোমার সখী যে মহিলা-সঙ্ঘ গঠন করিতে যাইতেছেন, তুমি তাহাতে তাঁহার সহায় হইতে পার। তোমার সাহায্য পাইলে তিনি আরও কয়েকটী গ্রাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

তোমার সখী তাঁহার স্বামীর অমতেই কাশী কিংবা অন্য কোনও তীর্থক্ষেত্রে যাইবেন, আগে লিখিয়াছিলে। কিন্তু আমি এরূপ অবাধ্যতার আবশ্যকতা মনে করি নাই; তাই সে সম্বন্ধে তখন কিছু লিখিও নাই। তাহাতে লাভ কিছুই হইত না, বিবাদ-বিসংবাদ

বাড়িত মাত্র। যাহা হউক, সে ভাবনাও কাটিয়া গিয়াছে; এখন দেখিবে, ভুবন তাহার পত্নীকে লইয়া তীর্থে কেন, যমের বাড়ীতে যাইতেও প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং তোমার সখীর ভাবনা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তুমি যেজন্য তাঁহার সঙ্গিনী হইতে চাহিয়াছিলে, তাহাও অজ্ঞাত নহি। তোমার চিত্তের এরূপ দুর্ব্বলতা যে এখনো দূর হইল না, সে জন্য মনে বড়ই দুঃখ হয়। কিন্তু তোমারই বা দোষ কি, আমাদের শিক্ষা-সংস্কার যেরূপ, সে ভাবেই ত সমাজটা গড়িয়া উঠিয়াছে; মনের এসব দোষ সারিবে কিসে? পরমেশ্বর কতদিনে তাঁহার দিব্য আলোকে তোমার মনের আঁধার সরাইয়া দিবেন, তিনিই জানেন। প্রতিরোজ নিয়মিতভাবে তোমার ঠাকুরের ধ্যান করিও; তবেই চিত্তের এসব মালিন্য কাটিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ সত্যের উপলব্ধি হইবে। এ সম্বন্ধে আগেই তোমাকে বিস্তৃত-ভাবে লিখিয়াছি; আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্বামী

নীরদবরণ

পুনশ্চ—আমার লেখা চিঠিগুলি ত তোমার সখীকে দেখাইয়া থাক। যদি দোষের কথা লিখিলাম বলিয়া অসন্তুষ্ট না হও, তবে এই চিঠিখানাও দেখাইবে। কারণ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দু'একটা কথা ইহাতে লেখা হইয়াছে।"

বীণা পত্রপাঠ করিয়া বিষম সমস্যায় পড়িল; পুনশ্চ মন্তব্যটা না থাকিলে তাহাকে এমন বিপন্ন হইতে হইত না। নানা কথা ভাবিয়া সে অবশেষে চিঠিখানা নিয়া সখীকে দেখাইল।

মনোরমা খুব মন দিয়া দুইবার তাহা পাঠ করিল, তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "সাধে কি ভাই, তোমার স্বামীর পদে এ দেশের উঁচু-নীচু ইতরশ্রেষ্ঠ, সকলে মাথা লুটায়? তিনি সত্যসত্যই দেবতা!"

বীণা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দৈন্য-ভরা স্বরে বলিল, "আমাকে সাহায্য কর্‌তে হবে, ভাই,—যাতে আমি তাঁকে ধর্‌তে পারি। আমার ত ভয় হচ্ছে, আমি অনেক পেছনেই পড়ে রয়েছি; হয়ত তাঁর নাগালই পাবো না। হায়! আমি বুঝি তাঁকে হাতে পেয়েও পেলাম না।—এমনি আমি অযোগ্য—নেহাত ক্ষুদ্র!"

মনোরমা অনুচ্চ গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি ভাগ্যবতী—তোমার স্বামী দেবতা। তোমার সে পুণ্যের অংশ আমাকে না দিলে আমিই কি তাঁকে ধর্‌তে পার্‌বো ভাই? দুজনের চেষ্টায় কতদূর কাজ হয়, দেখা যাবে।"

বীণা করুণ কণ্ঠে বলিল, "না ভাই, তুমি মধ্যে রয়েছ, তুমি দু'হাত বাড়ায়ে আমাদের দু'জনকেই টেনে-চেপে ধরো,—যেন আমিও পড়ে না যাই, তিনিও ছুটে না পালান; তারপর দু'জনকেই আপনার কাছে টেনে লও। মধ্যমণিকে সব দিকেই সামঞ্জস্য করে নিতে হয়।"

মৃদু-মধুর কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "ভুল বল্‌ছো কেন ভাই! মুকুটের সেরা মণিটাই হয় মধ্যমণি; তাই নীরদবাবুই আমাদের পল্লী-রাণীর বিজয় মুকুটের মধ্যমণি,—আমি নয়। আমরা সবে তাঁকে ঘিরে হাত ধরা-ধরি করে দাঁড়ালেই তিনি সব দিক দিয়ে সামঞ্জস্য করে নেবেন।"

স্বামীর প্রশংসায় বীণার চক্ষু সজল হইল; সে চুপ করিয়া মনে মনে একান্ত দীনভাবে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিল, 'হে ঠাকুর! তাই করো; সয়ের কথাই সত্য হোক্—পুণ্য দেশ-সেবার মধ্য দিয়েই আমাদের সকলের মিলন সফল হোক্।' প্রকাশ্যে সে বলিল, "আমি মণি-মাণিক্য—হীরা-জহরত হবার আস্পর্দ্ধা করি নে ভাই, আমি চাচ্ছি তাঁর পদ-পূজার অধিকার। দশের যিনি, আমি তাঁকে একেলা ধরে রাখ্‌বোই বা কি করে? সে কামনা করাও যে আমার পক্ষে একটা অসম্ভব স্বপ্ন!"

২৫

একমাত্র সন্তান বলিয়া চতুর্থ দিবসে মনোরমাই কেশববাবুর বাড়ীতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিল। শ্রাদ্ধের গোলমালে আরও দুইদিন কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিবসে মনোরমা নীরদকে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—তাহার বাবার মৃত্যুতে তাহার কাজের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়াছে, সেজন্য চিত্ত নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সে পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হওয়াতে তাহার স্বামী তাহার সহিত একটা আপোষ করিতে চায়। উভয়েই নীরদকে মধ্যস্থ মানিয়াছে; সুতরাং অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ভিন্ন লেপাফায় মনোরমার স্বামীর চিঠিও আসিল। একটা অনভিজ্ঞ মেয়ে-মানুষের হাতে কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার রাখিলে

পরিণাম ফল বিষময় হইতে পারে, এ বিষয়ে চিঠিতে সে নীরদকে সতর্ক করিয়াছিল।

পত্রখানা পাঠ করিয়া নীরদ মনে মনে অনেকখানি হাসিল, তারপর দু'খানা চিঠি নিয়াই সতীশবাবুকে দেখাইল। সতীশবাবু পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ লোকটার দুষ্ট বুদ্ধির ফলে তোমাদের কাজে বাধা পড়্‌বে, দেখ্‌ছি। তুমি বড় সরল, তাই খলকে বিশ্বাস করে আস্‌ছ। কিন্তু আর দেরী করোনা; এ সুযোগ হারালে বড্ড পেছনে পড়্‌তে হবে। কালই বাড়ী চলে যাও এবং মনোরমার ইচ্ছামত কাজ করো। তোমার ডাক্তারি বইগুলোও সঙ্গে নিও।"

"হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইগুলোর কথা বল্‌ছেন ত? ও ক'খানা বই সঙ্গে নিয়ে আর কি হবে? ও গুলো ত আমি দেখেছি।"

"তবু চিকিৎসকের কাছে বই থাকা ভাল; সময় সময় দেখ্‌বার দরকার হতে পারে।"

"আপনি কি মনে কচ্ছেন, আমি বাড়ী গিয়ে আর ফির্‌বো না? সে দিগ্‌কার কাজের ব্যবস্থা হলেই আমি ফিরে আস্‌বো; কলকাতার কোনো বিজ্ঞ কবিরাজের কাছে কিছুদিন আয়ুর্ব্বেদ পড়্‌বো।"

"সে ত ভাল কথা। আমাদের দেশের চিকিৎসা-প্রণালীতেই আমাদের রোগ সারান উচিত। তার দুটো দিকই আছে;—একটা দেশহিতের দিক্, অন্যটা স্বাস্থ্যের দিক্।"

নীরদ সবিনয়ে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আমি দেশের ভাঙ্গাচূরো জিনিষগুলোকে আবার গড়ে' তুল্‌তে চাচ্ছি,—অন্ততঃ আমাদের সে অঞ্চলে।"

নীরদ দেশে গিয়া প্রথমেই কালাচাঁদ মণ্ডলের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তখন বেলা আটটা। বলাইয়ের শ্মশান-প্রাঙ্গনে পাঁচখানা চালাঘর উঠাইবার জন্য সে আগে মণ্ডলমহাশয়কে লিখিয়াছিল এবং তাহার নক্সাও পাঠাইয়াছিল। তিনি তদনুসারে পাঁচখানা খড়ের ঘর উঠাইয়াছিলেন। সেগুলি দেখাইবার জন্য মণ্ডল মহাশয় নীরদকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ অঞ্চলের কোণে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আগে আগে যাইতে লাগিলেন; নীরদের চক্ষুর কোণেও দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত টল টল করিতে লাগিল। এদিকে এক দুই করিয়া বহু লোক নীরদকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল; তাহারা পিছনে আসিয়া জুটিল। সে অঞ্চলের ছোট-বড় ইতর-ভদ্র অনেকেই আসিল; অল্পক্ষণের মধ্যে শ্মশান-প্রাঙ্গণে বিরাট জনতা জমিয়া গেল। সমবেত লোকগণকে লইয়া নীরদ প্রাঙ্গনের দুর্ব্বা-ঘাসের উপর উপবেশন করিল এবং মৃত বন্ধুর আত্মার সদ্গতির জন্য পরমেশ্বরের নিকট অন্তরের নিবেদন জানাইল।

অপরাহ্ণে বলাইয়ের শ্মশান-ভূমিতেই বড় চালাঘর খানিতে একটী বৈঠক বসিল; তাহাতে সে দেশের গণ্য মান্য প্রায় সকলেই উপস্থিত হইল। ভুবনকেও সভায় যাইতে হইল; মনোরমা, বীণা-পাণি এবং আরও কয়েকজন মহিলা-কর্ম্মী সভায় গেল। আগেই নীরদ মনোরমার মত জানিয়া লইয়াছিল; এখন তাহা সকলের কাছে

প্রকাশ করিতে সে বলিল, "যে উদ্দেশ্যে সভা বসেছে, তার স্থূল মর্ম্ম আপনাদের কাছে বল্‌ছি। এ ঘরখানা সরায়ে এখানেই সাধারণের ধর্ম্মালোচনার জন্য একখানা…" তাহার বাক্য সমাপ্ত হইল না ভুবনের দিকে নজর পড়ায় সে থামিয়া গেল। তখন অন্যান্যের চক্ষুও ভুবনের মুখের উপর পড়িল; এ অবকাশে নীরদের চঞ্চল চক্ষুদ্বয় মনোরমার প্রখর দৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিমিষে কি মনোভাবের বিনিময় করিল, কেহ জানিল না; পরক্ষণেই কিন্তু সে স্বরটা একটু উঁচু করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "এখানেই একখানা পাকা মন্দির করা হবে, আর অন্য ঘরগুলোর ভিটি পাকা করে পাকা দেয়ালের উপর কাঠের ছাউনী দেওয়া ঘর হবে। দু'পার্শ্বের দুখানা ঘরের একখানিতে বস্‌বে সাধারণ লাইব্রেরী, অপর খানিতে দাতব্য চিকিৎসালয়। আর সাম্নের দু'খানার একখানিতে পুরুষ-রোগীদের আর অন্যখানিতে মেয়ে-রোগীদের থাক্‌বার স্থান করা হবে। সম্প্রতি এরূপেই কাজ আরম্ভ হবে; কিন্তু সমিতির তরফ থেকে চেষ্টা চল্‌বে, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলোর দিন দিন উন্নতি হয়। যে ক'দিন আমি বাড়ীতে থাক্‌বো, আমিই চিকিৎসার আর ধর্ম্মা-লোচনার কাজ চালাবো। পরে ধর্ম্মালোচনার ভার থাক্‌বে চন্দ্র-কুমারের উপর, আর চিকিৎসার জন্য একজন ভাল ডাক্তার রাখা হবে। লাইব্রেরীর ভার থাক্‌বে মোহনের উপর, পুরুষ-রোগীদের তত্ত্বাবধানও আপাততঃ সেই কর্‌বে; ছাত্র-সঙ্ঘ তার আদেশ উপদেশ নিয়ে সেবা-শুশ্রূষার কাজ কর্‌বে। মেয়ে-রোগীদের

তত্ত্বাবধান কর্‌বেন, এ সব অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী সহৃদয়া শ্রীযুক্তা মনোরমা রায়; আর শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী কয়েকজন মহিলা কর্ম্মীর সাহায্য নিয়ে মেয়ে-রোগীদের সেবা কর্‌বেন।" শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে মেঘের মত বিষাদ ভুবনের মুখময় ঘনাইয়া আসিল।

মনোরমা চক্ষু নত করিয়া মাথার মোটা দেশী কাপড়টা সাম্নের দিকে অনেকখানি টানিয়া দিয়া বলিল, "মিছামিছি কতগুলো সম্মানের বোঝা চাপায়ে আমাকে আর কাতর কর্‌বেন না, নীরদবাবু! আমি মোটেই তার যোগ্য নই। আপনি আমার আর সয়ের কাজ পৃথক্ করে দিয়ে বড্ড অবিচার কর্‌লেন। এ ব্যবস্থাটা আপনাকে বদ্‌লিয়ে দিতে হবে। আমরা দু'জনেই রোগীর তত্ত্বাবধান আর সেবার কাজ কর্‌বো। এ কাজে আমাদের দুজনেরই অভিজ্ঞতার অভাব; সুতরাং আমরা উভয়ে মিলেমিশে কাজ করে একের অভাব অন্যে পূরণ করে নিতে চেষ্টা কর্‌বো। আর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী বলে আমাকে যে সম্মান কর্‌লেন, তা কেন ঠিক হয়নি, তাও বল্‌ছি। আপনারা জান্‌বেন, আমি বাবার ইচ্ছা মতই কাজ কর্‌ছি। তিনি মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে তাঁর প্রাণের কথাগুলো লিখে বাক্সে রেখে গেছেন, তা পরে পাওয়া গেছে। বাবা তাতে সইও করেছেন, এই নিন তাঁর লেখা।" বলিয়াই সে তাহার পিতার লেখা স্মৃতি-লিপিখানা চন্দ্রকুমারের হাতে দিল। তখন যদি কেহ লক্ষ্য করিত, তবে দেখিতে পাইত, ভুবনের রক্ত চক্ষুদ্বয় তাহার পত্নীর কথা ও কাজে প্রজ্বলিত হইয়া কি ভীষণ অগ্নি-কণা বর্ষণ করিতেছিল!

চন্দ্রকুমার উচ্চৈঃস্বরে লিপিখণ্ড পাঠ করিতে লাগিল,—"মনোরমা—পাগলী মেয়ে, তোর মুখের দিকে চেয়েই আমি এতদিন সংসার-ধর্ম্ম করে আস্‌ছি। আবার বিয়ে কর্‌তে সকলে আমাকে পীড়াপীড়ি করেছিল; কিন্তু তোর দুঃখ হবে বলেই আমি তা করি নি। তোর সুখের জন্যই আমি সারাজীবন খেটে টাকা রোজগার করেছি। যা কিছু রেখে গেলাম, সব তোর; তুই ইচ্ছামত খরচ কর্‌বি। যার তার হাতে তা তুলে দিস্‌ নে মা! মনে রাখ্‌বি, আমি শরীরের রক্ত জল করে যা কিছু করেছি, তা সৎ কাজে ব্যয় করতে হবে। নীরদবাবুর উপদেশমত দেশের কোনো কাজে খরচ কর্‌লেই আমার আত্মার তৃপ্তি হবে, জান্‌বি।—শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, সাং প্রতাপপুর।"

ভুবন রক্তচক্ষু বিস্তৃত করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "শ্বশুরমহাশয় ত নীরদ-দার উপরই ভার দিয়ে গেছেন; কিন্তু এ ব্যবস্থাটা হচ্ছে শুধু তোমার ইচ্ছায়, মনোরমা! নীরদ-দা নিজে কর্‌লে কখনই এমন অবিচার কর্‌তেন না। এতে নিতান্ত অদূরদর্শিতাই দেখালে!"

সে সাধারণসভায় স্বামীর সহিত তর্ক করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মনোরমা মুখ নত করিয়া রহিল। নীরদ শান্তস্বরে ভুবনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ক্ষুণ্ণ হয়োনা ভাই, টাকা কড়িই সব নয়; তার চেয়ে যা' বড় জিনিষ, তা' পেতে যত্ন করো। সে-পথে গেলেই ভোগ-বাসনা, বিষয়-বৈভবের মোহ কেটে যাবে, সত্য বিষয়ে নজর প'ড়্‌বে, মনে আর তিলমাত্র খেদ রবে না। তুমি শিক্ষিত, সুচতুর আর ধনবান হয়েও যদি কেবল সত্যকে উপেক্ষা করেই

চলো, তবে সত্যের প্রচার হবে কিসে? ভুলো না ভাই, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

ভুবন উচ্ছ্বসিত বক্ষের উপর বাহুদ্বয় তুলিল, তারপর দুই বগলের মধ্যে দুই হাতের অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, "সত্য বুঝি নে, ভাই। তোমার পেছনে পেছনে চল্‌বো বলেই ত এসেছি। শুধু আমাকে নয়, আমাদের সকলকে উপদেশ দিয়ে তোমাকে চালিয়ে নিতে হ'বে। তুমি ধা করে উপরে উঠে গেলে অথবা নীরবে একধারে সরে পড়্‌লে চল্‌বে না; সকলকে নিয়ে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠ্‌তে হবে। তা না কর্‌লে আমাদের ছুটে পড়্‌বার সম্ভাবনা। আর যদি তুমি আমাদের সকলের দায়িত্ব বহন কর্‌তে না চাও, তবে দেশ ছেড়ে কোনো বিজন গুহায় গিয়ে আত্ম-সাধনা করগে, দেশের হিত সাধনের কথা আর মুখে তুলো না; নেতা হবারও সাধ করো না।"

নীরদ অতি ধীরভাবে বলিল, "ভাই ভুবন, আমি অতি নগণ্য —তোমাদের দাসানুদাস। আমি সাধক কি নেতা হবার স্পর্দ্ধা করি নে; আমি চাই সকলের সেবা কর্‌তে। আমার শক্তিও সকলকে ধরে রাখ্‌বার মত বড় নয়। সত্যই শুধু ধরে রাখেন,—যখন সত্যকে দৃঢ় করে আঁকড়িয়ে ধরা যায়। এসো আমরা তাই করি; তা কর্‌লেই সত্য স্বরূপে আমাদের কাছে ধরা দেবেন। কিন্তু চাই, সরল প্রাণ আর শুদ্ধবুদ্ধি—যাতে তিনি ধরা দিয়ে থাকেন। ভাই, মূলে সত্য না থাক্‌লে মঙ্গলের আশা নেই।"

ইতি